ব্রহ্মময়ী

("ব্রহ্মময়ী" চিত্রের ব্যাখ্যা-পুস্তক)

ঐ দেখ সেই মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্তলীলা॥

শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

 মূল্য ।৵০ আনা।

প্রকাশক—
শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
দেওয়ানজী ষ্ট্রীট
রিষিড়া, জেলা হুগলী

প্রিণ্টার শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
কটন প্রেস,
৫৭, নং হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।



অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্,

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ব্রহ্মময়ী গ্রন্থ ও চিত্রের,

উৎসর্গ-পত্র

যে স্নেহময়ী মাতা, আমাদের বাল্যাবস্থায়,
আমাদের, স্নেহময় পিতার কোলে মাথা রাখিয়া,
অকালে মহাশক্তিতে বিলীনা হন—
এবং যে ঋষিকল্প পিতা, স্বীয় ভাবী-মৃত্যু-দিন,
নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক,
৺কাশীধামে যাইয়া, নির্দ্ধারিত দিন মধ্যে,
শিবত্ব-পদ লাভ করেন ;—
হতভাগ্য আমরা ;
যাঁহাদের সেবা কার্য্যে বঞ্চিত হইয়া,
এ জীবনে, অনুতাপ-দগ্ধ—
"সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও ঈশ্বরী-স্বরূপা, পিতা ও মাতার"
সন্তান—
আমরা ভাই ভগ্নী কয়টি মিলিয়া,
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ;
এবং চিত্রখানি,—
ইহার প্রকৃত অধিকারিণী, অকালে কাল-আকর্ষিতা,
"একটি ছিন্না লতিকার"
উদ্দেশ্যে,
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, উৎসর্গ করিলাম।

ভূমিকা

পরম পূজনীয়, পরমারাধ্য শ্রীগুরু-কৃপায়, যাহা এক সময়ে অনুভূত হইয়াছিল, শাস্ত্রার্থের সহিত তাহার ঐক্য এবং তাহা তত্ত্ব বহুল হওয়ায়, নিজেরই পরিচালনার জন্য তাহা, যথাশক্তি চিত্রিত ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে সে সকল, শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত করিলে, তিনি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে, "যখন লিখিয়া রাখিয়াছ, তখন ভবিষ্যতে এ সকল প্রকাশ করিলে, অনেকের উপকার, অথবা আনন্দ-বর্দ্ধন হইতে পারিবে, এবং অবস্থা অনুকূল হইলে তাহা করিও" তাঁহার এই কথাই এক্ষণে, উল্লেখ যোগ্য। সে আজ সাত বৎসরের কথা। শ্রীগুরুদেবের এক্ষণে ৺পুরুষোত্তম প্রাপ্তি হইয়াছে, আমারও জীবন-নাট্যের চতুর্থাঙ্ক অভিনীত হইতেছে। এইজন্য অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল না হইলেও, অতি কষ্টে "ব্রহ্মময়ী" চিত্রখানি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে লোক-লোচনের গোচরীভূত করা হয়। মাত্র দুই সহস্র ছবি ছাপা হইয়াছিল, দেড়মাসের মধ্যে তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় বসুমতী, নায়ক, অমৃতবাজার, প্রভাকর আদি ৫।৬ খানি ব্যতীত, অন্যান্য সংবাদ পত্রকে উপহার দিতে পারি নাই। সংবাদপত্র ও নানাস্থান হইতে আগত পত্রগুলির, প্রশংসাবাদ উদ্ধৃত করিয়া, বিজ্ঞাপনে প্রসার বৃদ্ধি করিতে আমার ইচ্ছা নাই ; কারণ ইহা বিজ্ঞাপনের জিনিষ নহে।

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞানের, আদি জননী ভারতমাতার দুর্দ্দিনের এই পরিবর্ত্তন সময়ে, "যাঁহারা ধর্ম্মই জাতীয়-উন্নতির প্রথম সোপান" বলিয়া মনে করেন অথবা উহাতে যাঁহাদের আগ্রহ আছে, তাঁহাদের জন্যই

ছবিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে, ছবিখানিতে, ও তদন্তর্গত তত্ত্বের ব্যাখ্যা-পুস্তকের জন্য সাধারণের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, এতদুভয়ই প্রচুরভাবে প্রচারের চেষ্টায় রহিলাম। ভারতের ভাণ্ডারে যে সকল রত্ন, আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, ও তাহা লাভ করিবার যে সকল সরল পন্থা প্রদর্শিত আছে, তাহা জানিতে, চিনিতে, বা তাহার অনুসরণ করিতে না পারায়, আমাদের এত দুর্দ্দশা; যাহা অবলম্বন করিয়া অন্যান্য অনেক জাতি ধন্য হইয়া যাইতেছেন, ছবিখানি সেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান তত্ত্বের মানচিত্র, এবং পুস্তকখানি স্মারকলিপি মাত্র। ইহা সেই চির-সত্য পুরাতন তত্ত্বের সঙ্কলন, সুতরাং ইহাতে আমার কোন কৃতীত্ব নাই। বিষয় অতি মহান—আমার বিদ্যা, বুদ্ধি অতি সামান্য, অনেক ত্রুটি থাকিতে পারে, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

পূর্ব্বোক্ত রত্ন সকলের অধিকারী হইবার পথে, এতদ্দ্বারা যদি কেহ কিঞ্চিৎ উপকারও লাভ করিতে পারেন, তবেই আমার সার্থকতা।

গ্রন্থকার

ব্রহ্মময়ী

ওঁ

গুরবে নমঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রতিপাদ্য

এই অনন্ত রহস্যময় জগতের মধ্যে, জীবলোক-শ্রেষ্ঠমনুষ্যলোকের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে জীবনের লক্ষ্য কি? হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টানাদি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, অথবা প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট বা মুষ্টি-ভিক্ষান্ন-জীবী কৌপীনধারীই হউন, এক ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থ, এক মনুষ্যজাতির জীবনের মূল লক্ষ্য যে, প্রকারান্তরে এক এবং সার্ব্বজনীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, সকল ধর্ম্মাবলম্বীই সেই এক, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। রূপ, গুণ ও ক্রিয়াবৈচিত্রময়—এই একই জগতে, একই রূপ, প্রাণ, মন, ও দেহ লইয়া একই পথের পথিক হইয়া বিভিন্ন যানারোহন করিয়া চলিলেও, লক্ষ্যীভূত গন্তব্যস্থল যে একই সত্যে পর্য্যবসিত, এবং সেই সত্য যে একমাত্র ঈশ্বর, তাহা মনুষ্যমাত্রেই স্বীকার

করেন। সেই সত্য—অর্থাৎ সৎ-স্বরূপ ঈশ্বরই যে, স্বীয় চিৎ ও আনন্দ-রূপিনী—ইচ্ছাশক্তি বিকাশ পূর্ব্বক এ জগৎ রচনা করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ অগ্রগামিগণের সে বিষয় অবিদিত নাই। মানুষ এ জগতে জীবে প্রেম ও নামে রুচি এই দুই মহাভাবের সাহায্যেই যে, সেই সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন তাহাও সর্ব্ববাদি-সম্মত মত।

জীবমাত্রেই,—এ জগতে যে সুখের জন্য লালায়িত, সেই ঐহিক সুখ সম্ভোগের পরিণতি ও পরিতৃপ্তি রূপ—ধর্ম্ম অর্থ ও কাম, এবং এই তিনের পরিত্যক্তি-রূপ-মোক্ষ—এই চতুবর্গফল, সেই ঈশ্বর-সন্নিধানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"জীবে প্রেম ও নামে রুচি" মানবীয় ধর্ম্মের পরিণতি, এবং ইহাই "সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম"—এই ধর্ম্ম সহায় করিয়া অর্থলাভ, ও ক্রমে কামনা পরিতৃপ্তি হইলে পর, লক্ষ্যীভূত মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। মানবাত্মা তখন, ঈশ্বর-সন্নিধানে চিরশান্তিসুখ ভোগ করিতে থাকেন—ইহাই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সারমর্ম্ম। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চতুবর্গলাভই মনুষ্যজীবনের "সার্ব্বজনীন লক্ষ্য"।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিপন্ন

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ-লাভই মনুষ্যজীবনের "সার্ব্বজনীন লক্ষ্য"। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামই ভোগ্য-বিষয় এবং মোক্ষে ত্যাগ। মোক্ষে লক্ষ্য রাখিয়া ভোগ করিলে, সে ভোগ মোক্ষ-প্রাপ্তির কারণই হয়, কিন্তু সেই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলেই, ভোগের আশা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এই মায়িক জগতে মায়াবদ্ধ মানুষ-জাতি কালপ্রভাবে ঐহিক ভোগে মত্ত হইয়া, মোক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ; তখন ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামের সার্ব্বজনীন ভাব, সঙ্কুচিত হইয়া, দেশ, সমাজ, বা ব্যক্তিগত-ভাবে আকৃষ্ট হয়। এইরূপে ক্রমে ধর্ম্মাদিতে গ্লানি উপস্থিত হইয়া, জগতে নানারূপ অত্যাচার অশান্তি, দুঃখ ও কষ্টের আবির্ভাব হইতে থাকে। এইরূপ সময়ে ভগবৎ-প্রমুখ-অবতারগণ, এই মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সাময়িক গ্লানি দূরীকরণপূর্ব্বক, সেই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, ইহাই যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়ম।

বুদ্ধদেবের সর্ব্বজীবে প্রেম-প্রতিষ্ঠা ও নির্ব্বাণ-মুক্তি, এবং শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবের অদ্বৈতবাদ, প্রচারের পর, এবং আধুনিক কালের ন্যূনাধিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব

এই চিরসত্য ধর্ম্মের উদ্দীপনা করিয়াছিলেন। স্বার্থের দাস মানুষ যখন পুনরায় তাহা ভুলিল; ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আবার তাহা প্রচার করেন। এখন তাহারই ক্রিয়া হইতেছে, এবং তাহাতেই সমস্ত ধর্ম্ম-জগৎ আলোড়িত হইতেছে। "জীবে দয়া ও নামে রুচি"-রূপ শান্তিময় রাজ্যের দৃশ্য, মানবজাতির মানস-চক্ষের সম্মুখে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। মানবজাতি সে রাজ্যে বাস করিবার জন্য, সে আনন্দ ভোগ করিবার জন্য, সেই ক্ষণিক দৃশ্যের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে।

কলিযুগে ভারতে যেমন, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব ও পরমহংসদেবাদির দ্বারা এই সত্যধর্ম্ম বিকশিত হইয়া, ক্রমে তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-জগতে প্রচারিত হয়; খৃষ্ট মহম্মদাদি মহাত্মার প্রচারিত ধর্ম্মের তরঙ্গও, সেইরূপ প্রতীচ্য ও প্রাচ্য-জগতে ন্যূনাধিকভাবে, তৎকালীন মলিনত্ব দূর করিয়াছিল। এই সার্ব্বজনীন ও সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এই সকল 'ভগবান্'-আখ্যাধারীগণের কোন মতভেদ নাই। সুতরাং ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিধিই "সার্ব্বজনীন বিধি এবং পন্থা"।

যদিও এক্ষণে, পৃথিবীতে নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত হইয়া নানারূপ মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, অতি প্রাচীনকালে, মনুষ্যজাতির জীবনের লক্ষ্য ও তন্নির্দ্দেশাত্মক ধর্ম্ম, এক-প্রাকৃতিক, সার্ব্বজনীন ও অদ্বিতীয় ভাবেই বর্ত্তমান ছিল।

পৃথিবীর স্থলভাগ এক্ষণে যে আকারে অবস্থিত, পুরাণে তাহা জম্বুদ্বীপ নামে বর্ণিত আছে। জম্বুদ্বীপ, সপ্তদ্বীপা ধরণীর পঞ্চম দ্বীপ। পূর্ব্বে ক্রৌঞ্চ, প্লক্ষ, শাল্মলি ও কুশ নামে আরও চারিটি দ্বীপের ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহারা ক্রমান্বয়ে জলমগ্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান জম্বুদ্বীপের উদ্ভব করিয়াছে। ভবিষ্যতে, জম্বুদ্বীপও জলমগ্ন হইয়া

শাক ও পুষ্কর নামে আরও দুইটী দ্বীপের ক্রমান্বয়ে উদ্ভব করিবে। পৃথিবীর এইরূপ পরিবর্ত্তনই খণ্ডপ্রলয় নামে কথিত হয়। বর্ত্তমান জম্বু-দ্বীপের অধিপতি বৈবস্বত মনু। মনু ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। ইহা মানবজাতির অধিনায়কত্ব পদ এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ, মানুষই ক্রমোন্নতি পথে সাধনার দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্বে আরও ছয় জন মনুর আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা জ্যোতির্ম্ময় দেহধারী। সম্ভবতঃ এই বৈবস্বত মনুই, মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রন্থে নুঃ বা নোয়া নামে বর্ণিত আছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মনুষ্য-জাতি, এই বৈবস্বত মনুর বিধানমত পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন। কালক্রমে মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তার লাভ পূর্ব্বক, আদি মনুষ্যজাতি হইতে তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়েন। এই আদিম মনুষ্যজাতিই আর্য্যজাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান মধ্য এসিয়ায় ছিল, ইহা অনেকে নির্দ্দেশ করেন।

"আর্য্যজাতির প্রথম শাখা ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েন; ইঁহাদের সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল "ধর্ম্ম"।

দ্বিতীয় শাখা, মিশর, ক্রীট, আরব, ও ভূমধ্য-সাগরের দক্ষিণ উপকূল, ইত্যাদি স্থানে বিস্তৃতিলাভ করেন; ইঁহাদের সভ্যতার মূলমন্ত্র ছিল "বিজ্ঞান"।

আর্য্যজাতির তৃতীয় শাখা পারস্যের দিকে বিস্তৃত হয়েন, ইঁহাদের সভ্যতার মূল মন্ত্র ছিল "শুদ্ধি"।

চতুর্থ শাখা, গ্রীস্, রোম. প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া যে সভ্যতা স্থাপন করেন, তাহার মূল মন্ত্র হয় "সৌন্দর্য্য"।

পঞ্চম শাখা, জর্ম্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া যে সভ্যতা স্থাপন করেন, তাহার মূল মন্ত্র হয় "ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিযোগিতা"।*

এইরূপে, কালক্রমে মনুষ্যের সংখ্যা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তদানুসঙ্গিক ভোগ ও বিলাস বাসনা বাড়িতে লাগিল, ততই, দেশ, কাল ও পাত্র বিভেদে, নিজ নিজ দেশবাসীর সুবিধানুযায়ী ধর্ম্মও, তত্তৎ দেশের মনীষিগণ কর্ত্তৃক, উক্ত আদি ধর্ম্ম হইতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। এইরূপেই নানা দেশে নানা ধর্ম্ম তত্তৎ দেশবাসীর নির্দ্দেশাত্মক হইয়া উঠিল, যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি। তখন যদিও সকল দেশের বিভিন্ন ধর্ম্ম মতই, সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিল; কিন্তু সার্ব্বজনীন লক্ষ্য আর সেরূপ স্থির রহিল না, এবং দেশভেদে আচার ব্যবহারাদিও বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া পড়িল।

সার্ব্বজনীন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ, ইহলোকের সুখ-সম্ভোগ ও বিলাস-বাসনা চরিতার্থতাই জীবনের লক্ষ্যস্থানীয় করিল, কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহ জীবনকে ক্ষণস্থায়ী বিবেচনায়, পরলোক-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল। কেহ বা নিজ কল্পনানুযায়ী অনির্দ্দিষ্ট পরলোক গঠন করিয়া তাহার অনুকূল মতে জীবন-যজ্ঞে ব্রতী হইল। কেহ বা পরলোকের কথা ভুলিয়া নাস্তিক হইল, কেহ ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিল, কেহ বলিল ঈশ্বর নিরাকার; আবার কেহ বলিল, ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার উভয়ই। পৃথিবী অনন্ত রহস্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, নানারূপ মতান্তর হইতে লাগিল, বাক্‌বিতণ্ডা হইল, যুদ্ধ হইল, কেহ মরিল, কেহ বাঁচিল।

কখন বা কেহ এ সমস্যার মীমাংসায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,

* ইহা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের উক্তির সারসংগ্রহ করিয়া বর্ণিত হইল।

"আমি ঈশ্বরের প্রেরিত, তোমরা সকলে আমার কথা শুন", কেহ বলিলেন, "আমি তাঁহার পুত্র", কেহ বলিলেন, "আমি তাঁহার দোস্ত, অর্থাৎ বন্ধু"। কেহ বলিলেন, "আমি তাঁহার অংশ", আবার কেহ বলিলেন "সোহহং" অর্থাৎ তিনিই আমি। তন্মধ্যে, কেহ নির্য্যাতন ভোগ করিলেন, কেহ নিহত হইলেন, কেহ নিজ দেশে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া পর দেশে পূজা পাইলেন, কেহ বা নিজ সমাজেই পূজিত হইলেন। কেহ ইহ জীবনে পূজিত হইলেন কেহ বা জীবনান্তে পূজা পাইলেন; আবার কেহ 'ভগবান্, আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ইহজীবনে এবং জীবনান্তেও পূজিত হইতে লাগিলেন।

সর্ব্বলীলাধারকালের আবর্ত্তনে, জগতের পূর্ব্বোক্তরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইহা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়গুণেরই ক্রিয়া। এক, ক্রম-প্রসারিত হইয়া দশের উৎপত্তির কারণ হয়, এবং সেই দশ, ক্রম-বিবর্ত্তিত হইলে, পুনশ্চ অনাদি একেই পরিণত হয়। সেই পুরাতন একই, আদি, অব্যক্ত ও সকলের সমষ্টি এবং তাহার পর হইতে দ্বৈত, ব্যক্ত এবং ব্যষ্টি। এইরূপেই এক সার্ব্বজনীন ভাব হইতে, দেশ, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তিগত ভাবের উৎপত্তি হইয়া জগতের নানা বৈচিত্র-সাধন পূর্ব্বক, ব্যষ্টিরূপে নানা লীলা করিয়া, পুনরায় সেই অনাদি এক বা সমষ্টিতে পরিণত হয়, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এইজন্যই, কালের এই আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনকে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে বিভক্ত করিয়া, তত্তৎকালের প্রাকৃতিক লীলারও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এই অবশ্যম্ভাবী কারণ বশতঃ, এক্ষণে মানবজাতি জীবনের সার্ব্বজনীন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেশ, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তিগত স্বার্থে আকৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং মতান্তর বিধায়ে বাক্ বিতণ্ডা যুদ্ধ বিগ্রহাদির ও নিবৃত্তি নাই। যে যে কালে এইরূপ কারণ উপস্থিত

হইয়াছে, সেই সেই কালে, যুদ্ধ বিগ্রহাদিরও উদ্ভব হইয়াছে। কতই উষ্ণ নরশোণিতস্রোতে ধরণীবক্ষ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে,—উন্মুক্ত কৃপাণ, নররক্ত পান করিতে করিতে নবধর্ম্ম-প্রচারে অগ্রসর হইয়াছে,—কত উপদেশ, বক্তৃতা ও প্রলোভনাদি, ধর্ম্ম প্রচারের সহায়স্বরূপ হইয়াছে। আবার কখন জ্ঞান আসিয়া জগতের অন্ধকার দূর করিয়াছে—কখন ভক্তি আসিয়া তাহার বিমল জ্যোৎস্নালোকে, মানবজাতিকে পরিপ্লুত করিয়াছে—কখনও বা প্রেম আসিয়া সেই পুরাতন সার্ব্বজনীন ভাবের বসন্ত-হিল্লোলে মানবজাতিকে উৎফুল্ল করিয়া, সেই এক অনাদি, প্রিয়তম পরমেশ্বরের সার্ব্বজনীন প্রীতি প্রচার করিয়াছে।

এক্ষণে কিন্তু, অশান্তিময় কালেরই ক্রিয়া হইতেছে। মানুষ স্বার্থের মোহে ক্রমে মনুষ্যত্ব-বিহীন হইতে বসিয়াছে; ইন্দ্রিয়-লালসা, ভোগ-বাসনা, ও সুখ-সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্যে, মানুষকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। একজন অতিরিক্ত ক্ষীর, সর, ননী খাইয়া পরিশ্রম অভাবে অগ্নিমান্দ্য রোগ আনয়ন করিতেছে, আর একজন এক পয়সার ছোলা খাইয়া সমস্তদিন অসুরের ন্যায় খাটিতেছে, কেহ বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় শীতাতপ সহ্য করিয়া জীবন যাপন করিতেছে, আর কেহ অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া, বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতেছে। কেহ স্বদেশোৎপন্ন শস্যে বঞ্চিত হইয়া দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, আর কেহ সেই শস্যাদি লুণ্ঠন করিয়া তাহা হইতে বিলাস-বাসনা চরিতার্থকারী মদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, সুখে পান করিতেছে।

এক ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থ, এক মনুষ্যজাতির প্রতি, মনুষ্যজাতির এই আচরণ কি এক-ঈশ্বর জ্ঞানের পরিচায়ক? যে মনুষ্যজাতি,—জীবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই, তাহার আহার্য্য-সংস্থান-ব্যবস্থার জন্য, ঈশ্বরকে

ধন্যবাদ দেয়, এ ব্যবহার কি সেই মনুষ্যজাতির? অথবা জীবনের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া সেই মনুষ্যজাতি আজ পিশাচজাতিতে পরিণত হইয়াছে; তাই এত কাড়াকাড়ি, এত মারামারি, এই ভীষণ জীবন-সংগ্রাম!

অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিপুণা, বিদুষী শ্রীমতী আনি বেসেণ্ট প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, এ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

But in the social condition of our day, thousands and millions of human beings are suffering; suffering starvation, suffering ill-shelter and ill-clothing; the children suffering because they are under-fed, and their whole lives, handicapped, by the hardships of their boyhood and their youth. Unrest everywhere, strikes and lock-outs. everywhere capital arrayed against labour, labour arrayed against capital. where-ever you look in the civilised world, you have the breaking down of a civilisation, which is based on selfishness, and therefore cannot endure.

অন্যত্র:—The social state is intolerable it cannot endure; it will be broken down, by its own weight; the weight of useless wealth on one side, the weight of horrible missery on other. Some remedy must be found, either by revolution or by teaching.

নভোমণ্ডল-বিহারী অসংখ্য পক্ষিকুলের, আহার্য্যের অভাবে মৃত্যু হয় না, কাননবাসী পশুকুলের, আহার্য্যের অভাবে মৃত্যু হয় না, জলতল-

নিবাসী জল-জন্তুদিগেরও আহার্য্যের অভাবে মৃত্যু হয় না, পিপীলিকা কীট পতঙ্গেরও আহার্য্যের অভাবে মৃত্যু হয় না, আর আত্ম-শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদক গর্ব্বোন্নত মনুষ্যজাতির যে প্রায়ই, দুর্ভিক্ষে বা আহার্য্যের অভাবে মৃত্যু হয়, ইহার কারণ কি? বিলাস-বাসনা-বিদগ্ধ লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের স্বার্থপরতাই, কি ইহার কারণ নয়?

হে মনুষ্যজাতি! যদি তুমি বিলাস-বাসনার কুহকিনী মায়ায় না মজিতে এবং জীবনের সার্ব্বজনীন লক্ষ্য না ভুলিতে, তবে বুঝি এ জগতে সেই সত্যযুগ চির-বর্ত্তমান থাকিত, আর তুমি সেই স্বল্পায়াস-লব্ধ আহার্য্যে পরিতৃপ্ত হইয়া, এই অনন্ত বিশ্ব ও বিশ্বপতির ধ্যানে তন্ময় হইয়া, অনন্ত-জ্ঞান ও অসীম আনন্দ উপভোগে, এই নশ্বর জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিতে!

যে পরিবর্ত্তনশীল ও বৈচিত্র-বিধায়ক কালের লীলায়, আজ তোমাদের এ হেন দশা উপস্থিত হইয়াছে, সে কালও যে পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল মানবগণ অনুভব করিতেছেন। অতএব তুমিও তোমার কাল-নিশার জাড্য পরিহার করিয়া, তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন হেতু—তোমায় মানবজীবনের বিশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে সার্থকতা সাধনের জন্য,—পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এই অনিত্য জগতের, নশ্বর জীবন-বিশিষ্ট হে মনুষ্যজাতি! এস আমরা ছুঁৎ-মার্গ, আত্মাভিমান, ও জাতীয় সংকীর্ণতা, ত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্ম-নিহিত সত্য-তত্ত্বে লক্ষ্যস্থির রাখিয়া, পিতৃপুরুষগণের পদানুসরণ-পূর্ব্বক, স্বীয় দেহ, আত্মা, আত্মীয়, গৃহস্থ, পল্লী, সমাজ, সম্প্রদায়, সংঘ, জাতি, বিদেশ, বিজাতি, এবং ক্রমশঃ বিশ্বের সার্ব্বজনীন-মঙ্গল-বিধায়ক "প্রতিষ্ঠান" আদির রচনা করিয়া মানবজীবন সার্থক করি! আমাদের এই শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে,

আত্মমর্য্যাদার গৌরবান্বিত মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়া, সেই বিশ্বমঙ্গলের প্রাতরোপাসনায় রত হই। সেই বিশ্বমঙ্গলের মঙ্গলময় বিধানে, কালনিশার এই অবশিষ্ট তিমির শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। ব্রহ্মণ্য-ভাস্বর, বিষ্ণুতেজ, বিবস্বান্ সূর্য্যদেব—শীঘ্রই জগৎকে প্রকাশ করিয়া, আমাদের অভিলষিত কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রদান করিবেন। যে মোহের উপাধানে মস্তক-নির্ভর করিয়া, আলস্যের শয্যায় আমরা নিদ্রিত ছিলাম; সেই আলস্য দূরীকরণপূর্ব্বক, আত্মনির্ভরতার নবজীবন প্রদানের জন্য, ঐ দেখ পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া সহস্রাংশু সূর্য্যদেব সহস্র বাহু প্রসারণ করিতে করিতে জবাকুসুমশঙ্কাশংরূপে উদয় হইতেছেন। বিহঙ্গমকুলের আনন্দ-উচ্ছাশকৃত স্বর-লহরীতে ঐ শোন জগত মুখরীত হইয়া উঠিল; শঙ্খঘণ্টা রবে, দেবমন্দিরাদি নিনাদিত হইতে লাগিল; অতঃপর এস আমরা আত্মনির্ভরতা সহায় করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারে সচেষ্ট হই। আত্মসাক্ষাৎকারের ফলেই, আমরা সর্ব্বমঙ্গলা বিশ্ব-জননী মহাপ্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিব। কৃপাময়ী মাতার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, ঐ দুরতিক্রম-প্রভাব-বিশিষ্ট কালকেও জয় করিতে পারি। কারণ, সেই মহাকালও যে তোমার বিশ্বজননী মাতার পদদলিত। সেই রাতুল পাদ-পদ্মে যে চতুর্ব্বর্গ রত্নহার নিত্যশোভা পাইতেছে, সে আমাদেরই জন্য। মোক্ষ, পরমার্থ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্যাদি-রত্ন গ্রথিত হইয়া সেই হার মা আমাদিগকেই দিবার জন্য ব্যকুলা। কিন্তু মা কৃপাময়ী হইলেও ন্যায়ের সৃষ্টিকর্ত্রী, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারেন না; তুমি উপযুক্ত না লইলে পাইতে পার না। এই বিশ্বে যিনি উপযুক্ত হইতেছেন, তিনি উহা লাভ করিয়া, জগৎকে উহার প্রভায় প্রভান্বিত করিয়া, ধন্য হইয়া যাইতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীতে নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত হইলেও, ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্র যে অতীব প্রাচীন, ইহা আধুনিক কালে সকল দেশের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এই হেতু ইহাই, জগতের আদি ধর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হয়। অপৌরুষেয় বেদই ইহার প্রমাণ। বেদ, আদি, সার্ব্বজনীন ও প্রাকৃতিক ধর্ম্মমূলক বলিয়া, অপৌরুষেয় উপাধি লাভ করিয়াছেন। বেদ, সার্ব্বজনীন প্রেম ও ভগবদ্ভক্তি-মূলক মহাভাবদ্বয়-সমন্বিত ব্রহ্মনিষ্পন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। বেদান্ত, উপনিষদাদি, সমস্ত সনাতনধর্ম্ম-শাস্ত্রই মানবজাতিকে প্রথমে ব্রহ্ম-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া পবিত্র হইতে, এবং তদানুকুল্যে সমস্ত প্রাকৃতিকজ্ঞান লাভ করিয়া, পরে সেই বিশ্ব-প্রকৃতির উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতিকে লইয়াই জীবের জীবনযাত্রা, এবং ব্রহ্মজ্ঞানই সেই জৈবভাব হইতে পরিত্রাতা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে, প্রাকৃতিক-জ্ঞানের পূর্ণতাও হয় না। আর্য্য ঋষিগণ এইজন্য বিধান করিয়াছিলেন, যে বালক সপ্তম বৎসর বয়সে, গুরুরূপ ব্রহ্মসমুদ্রে মগ্ন হইয়া,—ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে,—প্রথমে জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিবেন। পরে যথাকালে, পবিত্র চিত্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়া, পুরুষ ও প্রকৃতিস্বরূপা পিতা ও মাতার সেবা,—আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত প্রেম ও সর্ব্বজীবে দয়া বিতরণ করিতে থাকিবেন। তৎপরে, বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনে, নিজ ক্ষয়শীল দেহের ও আত্মার

উন্নতিসাধন করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক, জীবন্মুক্তভাবে জীবের হিত-সাধনে, জগতে বিচরণ করিবেন।

গুরুই সান্ত ব্রহ্ম, এবং পিতা-মাতাই সান্ত পুরুষ ও প্রকৃতি। পরম ব্রহ্মই অনন্ত ব্রহ্ম, সর্ব্বলীলাধার মহাকালই অনন্তপুরুষ ও বিশ্ব-প্রকৃতিই অনন্ত প্রকৃতি। মানুষ প্রথমে সান্তজ্ঞান সাধন করিয়া, পরে অনন্তে তন্ময় হইবেন, ইহাই বিধি। তখন এই অনন্ত-প্রকৃতি প্রদত্ত উপহার,— ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুবর্গ বিধায়ী জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাহায্যে জগংস্থ জীবকুলকে আত্মীয় জ্ঞানে, তাহাদের সহিত প্রেম, এবং তাহাদের হিতসাধন করাই, এই নশ্বর মানব জীবনের সার্থকতা ও সার্ব্বজনীন লক্ষ্য। ইহারই নামান্তর চতুবর্গ লাভ। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কোন মতভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, এই সার্ব্বজনীন সত্য, কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই অস্বীকৃত হয় নাই। যে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই হউক, স্বধর্ম্মই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়— দেশভেদে উহাদের আচার ব্যবহারাদি পার্থক্য-বিশিষ্ট,—এবং কাল প্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও—এই সার্ব্বজনীন সত্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা, যদি কোন মানবজাতির অনভিপ্রেত হয়, তবে হিংস্র পশুজাতি হইতে যে, সে মানবজাতির কোন বিশেষত্ব নাই, ইহা বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর-সান্নিধ্য বা চতুবর্গ-লাভই, মানবজীবনের সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন লক্ষ্য। এই চারিটি একাদিক্রমে পূর্ণ করিতে পারিলেই, চতুর্ব্বর্গলাভ সম্পূর্ণ হয়। তন্ন্যূনে অর্থাৎ কেবল ধর্ম্ম, কেবল অর্থ বা কেবল কামে, অথবা উক্ত দুইটি বা তিনটির সমন্বয়েও ইহা সম্পূর্ণ হইবার নহে। অধিকন্তু তাহাতে দুঃখ ভোগেরই সম্ভাবনা। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে এক্ষণে, ইহার বিপরীত হইয়া, দুঃখ ও অনর্থে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহার

ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, হয়ত তাহার অর্থ নাই, অথবা অর্থ আছে, ধর্ম্মজ্ঞান নাই। সুতরাং অতৃপ্ত-কামের ত্যাগ অসম্ভব হওয়ায়, মোক্ষ সুদূর-পরাহত হইয়াছে। চতুর্বর্গলাভ যেন অসাধ্য-সাধন বিবেচনায়, তাহার আলোচনা পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত-প্রায় হইয়াছে, এবং বিলাস-ভোগরূপ তিমিরে তাহার স্থান অধিকার করিয়া, বহুমূল্য মানবজীবনকে উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। আর্য্য গুরুগণ এই চতুর্বর্গফল, সহজলব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা না করিয়া উদরান্ন-সংস্থান ও বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, অহোরাত্র ছুটাছুটি করিলে, উক্ত চতুর্বর্গলাভের কঠিনত্ব অনুমিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু হে মানবজাতি! যদি তুমি তোমার স্বার্থপরতা ও বিলাসভোগের কথঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া, সহজলব্ধ মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট হইতে পার তবে তোমার অহোরাত্র ছুটাছুটির অনেকাংশে লাঘব হইবে, তুমি মনোবৃত্তিকে উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন করিতে অবকাশ পাইবে। আত্মনির্ভরতা ও আত্মসাক্ষাৎকার পাইবে, এবং সেই আত্মানন্দ-বিধায়িনী জগজ্জননীর কৃপায় শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞানাদির উন্নতির পরাকাষ্ঠা-রূপ চতুর্বর্গলাভ করিয়া, ইহ এবং পরলোকেও ধন্য হইতে পারিবে।

আর্য্য গুরুগণ অধ্যাত্ম-বিদ্যার জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করিয়া আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতই, মানব-বুদ্ধির গোচরীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু, হায়, ভারতবাসী আজ সে বিদ্যার আলোচনা ভুলিয়া, ধর্ম্মভ্রষ্ট, অর্থহীন, অপূর্ণকাম, ও মোক্ষ-লাভানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-ভ্রষ্টতাই মানবের প্রথম পদস্খলন। রাষ্ট্রীয়, দেশীয়, সামাজিক, ও ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া, সেই নিত্য, সত্য, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মাচরণেই আবার তাহার উত্থান সম্ভবপর, ইহা এখনও অনেকেই অনুমান করেন।

ধর্ম্মাচরণেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয়। ভারতীয় নীতি-শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

আহার-নিদ্রাভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষ ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সাধনায় সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক, জাগতিক সমস্ত সুখ ও দুঃখ ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, পরে তাহা ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে করিতে, ক্রমশঃ দেহত্যাগ করাই মোক্ষলাভ। জীবের দেহত্যাগ বা মৃত্যু অনিবার্য্য। যে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে, সেই মৃত্যুও সুখ এবং আনন্দজনক হয়, সেই অবস্থার নামই মোক্ষ। ইহাই জীবন্মুক্তি বা সামীপ্য-মুক্তি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, যেমন উচ্চবিদ্যা শিক্ষার পথ সুগম হয়, সেই রূপ মোক্ষ বা সামীপ্য মুক্তি লাভ করিতে পারিলে, অপরা মুক্তি-ত্রয় লাভের পথ সহজ হইয়া যায়। এই জন্য মোক্ষই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য। ইতঃপরে সাধকের সূক্ষ্ম-শরীর ব্রহ্মলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হওয়াই সামীপ্য মুক্তি। সেই ব্রহ্মলোকে অবস্থান ও ব্রহ্মলোকের ক্রিয়ায় ক্রিয়াবান্ হওয়াই সালোক্য—মুক্তি। এই ঐশ্বরিক ক্রিয়াতেও পরিতৃপ্ত হইয়া,—সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়াত্রয়ের জনয়িত্রী, এবং এতৎসমূহের অতীত অবস্থার মূলীভূতা—শুদ্ধা ইচ্ছারূপিণী মহাপ্রকৃতিতে যুক্ত হওয়াই সাযুজ্য-মুক্তি। ইহার পরই নির্ব্বাণ; জগজ্জননী মহাপ্রকৃতির অঙ্গীভূত হইয়া, তদীয়া লীলায় পরিতৃপ্তি সাধনান্তে, পিতৃস্বরূপ, সেই এক, অনাদি, পরমপুরুষ নির্গুণ ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া পরম পরিতৃপ্তভাবে, স্থূলদেহ ত্যাগ করাই নির্ব্বাণ-মুক্তি।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রত্যক্ষ

নির্গুণ ব্রহ্ম—পরম পুরুষ বা নির্গুণ ব্রহ্ম কি? ইনি সেই এক, অনাদি, অব্যক্ত ও অনন্ত কোটী জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মূল এবং সমষ্টি। এই জগৎ আমাদের নিকট আংশিক-ভাবে পরিদৃশ্যমান, কিন্তু গগনপটে গ্রহ-নক্ষত্রাদির ন্যায়, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও তদতিরিক্তের মূল এবং সমষ্টি-রূপ, অনন্ত নির্গুণ-ব্রহ্মের ধারণা করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সেই জন্য বালক-বালিকাগণের ক্ষুদ্র মানচিত্রে যেমন অনন্ত মহাসমুদ্র চিত্রিত থাকে, এই চিত্রে অনন্ত ব্রহ্মও সেইরূপ কল্পিত হইয়াছেন। সমুদ্রজল, চাক্ষুষ গোচরীভূত পদার্থ, কিন্তু নির্গুণব্রহ্ম চাক্ষুষজ্ঞানের বহির্ভূত হওয়ায়, তাঁহার বিশেষ বর্ণনা অসম্ভব; এবং তাঁহার ধারণা করা বিশিষ্ট সাধন-সাপেক্ষ, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তিনি চৈতন্যময়, অতি সূক্ষ্ম, এবং নির্গুণ ও সগুণ ভেদে দ্বিভাব (চিত্রে দ্রষ্টব্য)

আর্য্য ঋষিগণ যে পরাৎপর, অনাদ্যন্ত, মহান্ সত্ত্বাকে, "ওঁ তৎসৎ" বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

নির্গুণং সগুণঞ্চেতি দ্বিধা মদ্রূপমুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়াহীনং সগুণং মায়য়া যুতম্॥

অর্থাৎ ভগবদুক্তি এই যে, নির্গুণ ও সগুণ আমার এই দুইরূপ; আমি নির্গুণ অবস্থায় মায়াহীন এবং সগুণাবস্থায় মায়াযুক্ত। মুসলমান

ও খৃষ্টধর্ম্মেও, সেই এক, নিরাকার, ঈশ্বরের ইচ্ছাই জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। তত্তৎ ধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা মহম্মদ ও খৃষ্টের, সেই একের সহিত যথাক্রমে বন্ধুত্ব ও পুত্রত্ব সম্বন্ধ নির্দ্দেশে, ব্রহ্মের দ্বিভাবের বিষয় প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, নির্গুণ বা নিরাকারের ইচ্ছার অস্তিত্ব, বা বন্ধুত্ব কিম্বা পুত্রত্ব সম্বন্ধ, অসম্ভব।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে, ব্রহ্ম মীমাংসিত হয়েন নাই। নির্গুণ ব্রহ্মের নিক্রিয় অবস্থার ভাবানুভূতি সাধারণ মানবজ্ঞানের অনধিগম্য ও অনাবশ্যক বোধে, ব্রহ্মের ব্যষ্টি-ভাবরূপ সক্রিয় মনকেই, বৌদ্ধধর্ম্ম সেই সগুণ ব্রহ্মের স্থানে বসাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, মন স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইলেই, আত্মায় পরিণত হয়, এই আত্মাই ঈশ্বর। বৌদ্ধধর্ম্ম, মনোরূপ চঞ্চল দীপশিখাকে, ইন্দ্রিয়াদিনিগ্রহ দ্বারা স্থির করিয়া, সেই আত্মাকাশে বিলীন, বা নির্ব্বাণ করাই নির্ব্বাণ-মুক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং মনের সগুণত্ব ও আত্মার নিগুণত্ব এতদুভয়ই, প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা, সনাতন ধর্ম্মের বেদান্ত মতেরই অংশীভূত। সনাতন ধর্ম্মে অধিকন্তু, ব্রহ্ম, প্রকটভাবে নিষ্পন্নও হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের দ্বিভাবের বিষয় সকল ধর্ম্মই, প্রকরান্তরে স্বীকার করিয়াছেন!

"এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি" জ্ঞাত হইয়াও—সগুণভাবের অস্তিত্ব নিবন্ধনই, সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্রহ্মের ব্যষ্টিভাবে ভাবিত হইয়া, কাল-প্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। হিন্দু, তাঁহার বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র-নির্ণীত সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক-শক্তি সমূহকে, সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য, তেত্রিশ কোটী দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালপ্রভাবে উহা আধুনিক কালের ব্রহ্মজ্ঞানহীন-পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মুসলমান, তাঁহার বন্ধুত্ব-প্রতিপাদক মহাত্মার ভাবে ভাবিত হইয়াও, সেই এক ঈশ্বরের ইচ্ছা-সৃষ্ট জগৎস্থ

জীব-সমষ্টির সহিত এক্ষণে, বন্ধুত্ব রক্ষণ করিতে অপারগ হইয়া, স্বীয় ব্রহ্মজ্ঞান খণ্ডিত করিয়াছেন। খৃষ্টানও, সেই পুত্রত্ব-প্রতিপাদক মহাত্মার মহানুভবতা অনুভব করিয়াও, জীবসমষ্টির উপর এক্ষণে, সম্পূর্ণ স্নেহশীল ও প্রেমময় হইতে না পারিয়া, স্বীয় ব্রহ্মজ্ঞান সঙ্কুচিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইলেও, এবং এই প্রেম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়াও, মানব-মনের গতি ও সংযোগ-সাধনের মূলাধারস্বরূপ ব্রহ্মকে অপ্রকট রাখিয়া, মনকে অনির্দ্দিষ্ট আধারে, দীপ-নির্ব্বাণের ন্যায় নির্ব্বাপনের বিধান প্রদর্শন করায়, জীবের স্বাভাবিক ভোগ ও ত্যাগের পরিমাণ, অপরিমিত হইয়া কিঞ্চিৎ জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সামান্য ত্রুটি বশতঃ পৃথিবীস্থ মানবরাজ্যের ত্রিচতুর্থাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু, এই সকল মহাত্মাগণ যখন যে জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা ন্যূনাধিকভাবে একমাত্র ব্রহ্মমার্গই প্রকাশ পাইয়াছিল ; এবং তদনুসরণকারিগণ কর্ত্তৃক কালক্রমে তাহা বিকৃত হয় ও "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়া যায়। এই উত্থান ও পতন সগুণ ব্রহ্মরূপ মহাকালের নিয়ম, প্রকৃতি এবং ক্রিয়া। কেবল ধর্ম্ম কেন, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও সেই মহাকালের ক্রোড়ে, উত্থান পতনক্রমে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান। সুতরাং ইহাতে অনুশোচনার কারণ নাই ; কালে যাহার পতন হইয়াছে কালে তাহার উত্থানও অবশ্যম্ভাবী। ভারত এইরূপে অবনত দশাপ্রাপ্ত হইলেও দেখা যাক্ পূজ্যপাদ ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ কি সত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অবশ্য, কোন কোন আধুনিকের চক্ষে ভারতীয় আর্য্য-জাতি কতকগুলি বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিলেন বলিয়া, প্রতিভাত হইয়া থাকেন! কারণ, যে সময়ে তাঁহারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্যে

জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেনন, সে সময়েই, তাঁহারা জন্মান্তর রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া, কর্ম্মবাদ ও মানবজীবনের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক, অবিনশ্বর সত্যের সন্ধানে স্বার্থ-সাধন ও বিলাসভোগকে বলি দিয়া, সর্ব্ববাদি সম্মত প্রতিপাদ্য বস্তুর তত্ত্ব-নিষ্পাদনে "ওঁ তৎ সৎ" রবের নির্ঘোষ দ্বারা বিমান কম্পিত করিয়াছিলেন। জীব মাত্রেই, সার্ব্বজনীন প্রেম বিতরণের বিধান করিয়াছিলেন—স্বার্থ-সাধন, ভোগবিলাস ও গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের রক্ত শোষণ করেন নাই—মানুষকে তাহার জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই—প্রভূত শৌর্য্য, বীর্য্য, সত্ত্বেও, মানুষের রক্তের স্রোত বহাইয়া কাহারও রাজ্য, দেশ বা ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই—ছল, বল, ও কৌশলাদির দ্বারা কাহারও প্রকৃতি-প্রদত্ত ধন সম্পদাদি হরণ করেন নাই—এবং এ সকলের পরিবর্ত্তে, আধ্যাত্মিক রাজ্য অধিকার করিয়া সময়ের অপব্যয়ই করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু বর্ত্তমান যুগের প্রত্যক্ষ ব্যাপার দর্শনে ঐ সকল জড়বাদী আধুনিকের চক্ষু ফুটিয়াছে; এখন তাঁহারাই স্বয়ং অধ্যাত্ম তত্ত্বের শীতল ছায়ার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন।

এক অনাদি নির্গুণ ব্রহ্ম, সাধারণের ধারণাতীত, কিন্তু তাহার সগুণ-ভাব অনেকাংশে বোধগম্য। এইজন্য সগুণভাবসিদ্ধ দ্বৈতমতেরই, ভারতে প্রাধান্য। সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ বা অংশ; যেমন তট নিকটবর্ত্তী মহাসমুদ্রাংশ, যথা আটলাণ্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ইত্যাদি, পৃথিবীস্থ সেই একই জলভাগের অংশ-বিশেষ। সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানই, নির্গুণ-ব্রহ্মপদ-দাতা। অদ্বৈত মত নিষ্পাদিত নির্গুণ-ব্রহ্ম চরম লক্ষ্য হইলেও, তাহা সহজ লব্ধ করিবার জন্য, আর্য্য ঋষিগণ দ্বৈতভাব বা সগুণ ব্রহ্মকে বিশেষ ভাবেই প্রকটিত করিয়াছেন। কারণ দ্বৈতভাব প্রথমে সিদ্ধ হইলে, তবে অদ্বৈতভাবে প্রবেশাধিকার জন্মে।

সগুণ ব্রহ্ম—দ্বৈতভাব বা সগুণ ব্রহ্ম কি? সর্ব্বক্রিয়াধার অখণ্ড মহাকালই সগুণ ব্রহ্ম যে কালের ক্রোড়ে, আমাদের এই পৃথিবীর মত, কত কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। এমন কি, এই অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের আধার-ভূত মহা-আকাশও যে কালের আধেয়—ইনি সেই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিমান, সগুণব্রহ্ম। বিজ্ঞান শাস্ত্র বলেন:—৩৮১১০৯০০০ বর্গ ক্রোশ ব্যাপী আমাদের এই পৃথিবী—১৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ মণ ওজনের দেহটি লইয়া, ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রোশ হিসাবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছুটিতেছেন। এইরূপ সপ্তগ্রহে একটি ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর-জগত। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড যে কত কোটী কোটী আছে, তাহা একমাত্র সেই অনাদ্যন্ত পুরুষ ভিন্ন আর কেহ জানেন না। ঐ সকল গ্রহ রাত্রিকালে নক্ষত্ররূপে, আকাশে শোভমান হইয়া থাকে, এবং সেই আকাশের কথঞ্চিৎ অংশ আমরা দেখিতে পাই মাত্র। যাহা দেখিতে পাই তাহারই বা সংখ্যা কে করিতে পারে? ইহা যখন চাক্ষুষ দৃশ্য তখন ইহা ত উড়াইয়া দিবার নহে। তারপর, আমাদের এই পৃথিবীর উৎপত্তি ও স্থিতিকালের আলোচনা করিতে গেলে, প্রকৃতিই মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। অতি সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইল। আর্য্যযোগিগণ নির্ণয় করিয়াছেন:—

পৃথিবীর—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের স্থিতিকাল সর্ব্বসমেত ৪৩২০০০০ বৎসর। ইহাই এক মহাযুগ।

৭১ মহাযুগে—— ১ মন্বন্তর (এক একজন মনুর আধিপত্য কাল)

১৪ মন্বন্তর বা ৯৯৪ মহাযুগ, ও

সন্ধিকাল ৬ মহাযুগ,

সর্ব্বসমেত ১০০০ মহাযুগে — ১ কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবাভাগ।

রাত্রিভাগের পরিমাণ ও ঐরূপ; অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবা রাত্রির পরিমাণ আমাদের ৮৬৪০০০০০০০ বৎসর। এইরূপ ৩৬০ দিবসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়; এবং তাঁহার পরমায়ু এইরূপ ১০০ বৎসর; ইহাই এক মহাকল্প। ব্রহ্মার আয়ুস্কালের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫০ বৎসর গত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্বেতবরাহকল্প চলিতেছে, ইহা ব্রহ্মার আয়ুকালের ৫১ বৎসরের প্রথম দিন। এইরূপ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড বহু বহু আছেন বলিয়া পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়, এবং আকাশে নক্ষত্রাদি প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহা বিশ্বাস করিতেও বাধ্য হইতে হয়।

পক্ষান্তরে মানুষের পরমায়ু ১০০ বৎসর। পশ্বাদির পরমায়ু তন্নিম্নে, পক্ষি প্রভৃতির পরমায়ু আর কম। কীট পতঙ্গ আরও স্বল্পায়ু। জীবাণু কীটাণু আদি ক্ষণে উদ্ভব হইয়া ক্ষণে লয় পাইতেছে। এইজন্য আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছেন :—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—তিনি যে কত মহান্‌রূপে, এবং কত ক্ষুদ্ররূপে বিরাজিত হইয়া এই অসীম রহস্যময় বিশ্বলীলা বিকাশ করিতেছেন, তাহা ক্ষুদ্র মানুষ কি বুঝিবে? তবে আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে মনুষ্য-জন্মলাভ করিয়া আমরা, সেই মহানের মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ অনুধাবন করিতে পারি—সেই অখণ্ড কালকে আংশিক অনুভব করিবার শক্তি আমাদের আছে। ব্রহ্মার আধার বিষ্ণু, আবার বিষ্ণুর আধার মহাকারণরূপী মহা-কাল। এক্ষণে মহাকাল যে কিরূপ অনন্ত ও মহান্, তাহা পাঠক অনুমান করিবেন, অথচ তাঁহাকে কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না; কারণ মনুষ্যমাত্রেই এই কালের সত্ত্বা সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছেন।

অনন্তকালের ক্রোড়ে, জাগতিক সমস্ত পদার্থ যেমন সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের অধীন; ব্রহ্মাণ্ড সকলও সেইরূপ তাহাদের নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ হইলে লয় পাইয়া থাকে।

ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্তরূপ আয়ুষ্কাল শেষ হইলে, তদীয় ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়কালে সৃষ্টিলীলাত্মক ব্রহ্মার অন্তর্ধান হয় এবং স্থিতি-লীলাত্মক বিষ্ণু, সৃষ্টি-বীজসমূহ একীভূত করিয়া, মহাকালস্বরূপ,—কারণার্ণব আধারে, আত্মা-রূপী অনন্তশয্যাপরি, যোগনিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া, বীজসমূহের স্থিতি বিধান করিতে থাকেন। পুনশ্চ, যথানির্দ্দিষ্ট সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তদঙ্গজ পদ্মযোনি ব্রহ্মার পুনরাবির্ভাব হইয়া, পুনঃ সৃষ্টিলীলা বিকশিত হয়। এই তত্ত্ব যে ন্যায় ও বিজ্ঞান-সম্মত তাহা বিদ্বৎসমাজ একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কালই প্রধান এবং মহান্। সৃষ্টি এবং স্থিতি, কালেরই ক্রোড়ে, বিকশিত হয়। সমস্তই কালের অধীন। সৃষ্টি ও স্থিতি যেমন কাল-সাপেক্ষ, প্রলয়ে এবং প্রলয়ের পরেও, সেইরূপ কালের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং মহাকালই অবিধ্বংসী মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর। ইনি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত সমন্বয়ে, সগুণ ব্রহ্মরূপে জগতে, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান কর্ত্তা। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ, সগুণ ব্রহ্মকে মহাকাল, মৃত্যুঞ্জয়, মহেশ্বর, শিবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সদসৎ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক সমস্ত ক্রিয়ার আধারই, ইনি। লিঙ্গ পুরাণে উক্ত আছে :—

অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
হরয়শ্চ অসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ ॥

(চিত্রে দ্রষ্টব্য)

মহামায়া—এই অপার, অনন্ত, সগুণ ব্রহ্মের ধারণা করাই মনুষ্যের সাধ্যাতীত ; তাহার পর আবার ব্রহ্মের নির্গুণাবস্থা ; তাহা আরও

মহত্তর। এই জন্যই নির্গুণাবস্থা অব্যক্ত বলিয়া বর্ণিত হন। কিন্তু অন্ততঃ তাঁহার, অস্তিত্ব অনুভব না করিলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন হয় না, মীমাংসারও চরম সিদ্ধান্ত হয় না।

আংশিক প্রত্যক্ষীভূত সগুণ ব্রহ্ম এবং অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় যতটুকু আলোচিত হইল, তাহাতে মনে হয়, এবিষয়ে অনুশীলন করিতে যাওয়া যেন মনুষ্যশক্তির বহির্ভূত, এবং সে আশা করাও বাতুলতা মাত্র। যেন চৈতন্যহীন জড়-জলপূর্ণ অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া, বুঝিয়া, আনন্দ করিবার আর কেহ নাই। এবং তিনি এমনই মহান্ এবং চৈতন্যবিহীন যে তাঁহার নিকট—অতি ক্ষুদ্র আমাদের এই বিশ্ব-সংসারের কোন সংবাদই পৌঁছায় না! প্রকৃত তাহাই হইত, যদি মানুষ মহাশক্তি মহামায়ার কৃপায় বঞ্চিত হইত। মা না থাকিলে সন্তানের যে অবস্থা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইত। সগুণ-ব্রহ্মের সগুণত্বও অন্তর্হিত হইয়া অব্যক্তে মিশাইত। প্রকৃতই, সগুণ-ব্রহ্মের সগুণত্ব কিছুই নাই! ত্রিগুণধারিণী, ব্রহ্মময়ী, মহামায়ার প্রভাবেই তাঁহার সগুণত্ব। পাঠক! ঐ দেখুন, শিব শবাকারে পতি,—বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় নিদ্রিত—ব্রহ্মাও যোগরত। যেন সকলেই জড়ভাবাপন্ন। সগুণব্রহ্মের সগুণত্ব-বিধায়িনী ইচ্ছাশক্তি-স্বরূপিণী, চৈতন্যময়ী, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী, মহাপ্রকৃতি—মহামায়ার লীলার আধারই, সগুণ ব্রহ্ম বা মহাকাল মহেশ্বর। সেই আধারোপরি স্থিতা হইয়া, ইনি সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণাত্মক এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ক্রিয়ান্বিত ব্রহ্মলীলা বা বিশ্বলীলা প্রকাশ করিতেছেন। ইনি সগুণ ও নির্গুণে সংযোজিতা; ইঁহার নিম্নার্দ্ধ সগুণ ও উপরার্দ্ধ নির্গুণে সংমিলিত। ইঁহারই কৃপা যেন পূর্ব্বোক্ত মহাসাগরের তরণীস্বরূপ। ইঁহার কৃপায়ই, ক্ষুদ্র মানবীয় শক্তি, সেই মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া নির্গুণ অব্যক্ত অবস্থাও, কথঞ্চিৎ

ধারণা করিয়া সেই নিগুর্ণত্ব পদও, লাভ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। (চিত্রে দ্রষ্টব্য)

বিদ্যা ও অবিদ্যামায়া—জগজ্জননী মহামায়ার, জ্ঞান-বিরহিতা ইচ্ছাশক্তি বা অবিদ্যামায়ার দ্বারা, সগুণ ব্রহ্ম ও মহত্তত্ত্ব হইতে অজ্ঞানমূলক অপর-জগতের (জড়-জগতের) প্রকাশ হইয়াছে। তৎপরে, বিজ্ঞান-ময়ী-ইচ্ছাশক্তি বা বিদ্যামায়ার দ্বারা, তাহা, পর-জগত (জীব-জগত) রূপে পরিণত হইয়া নানা লীলা সাধন পূর্ব্বক, "তত্ত্বমসি"-জ্ঞান-লাভান্তে, অজ্ঞানকে বিনাশ করিয়া "সোঽহং" ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, ব্যষ্টি-রূপে স্বীয় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মানন্দ ভোগকরণই, ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। অজ্ঞান হইতেই, জগতের প্রকাশ। সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইলে, সেই জগৎ-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই যে অবশিষ্ট থাকে; তাহা সাধকগণের অবিদিত নাই। এই অজ্ঞান ও জ্ঞানের সংমিলনেই জগতের অস্তিত্ব। অজ্ঞান বা তমোগুণের আধিক্য বিনাশ করিবার জন্যই, আদিমাতা সংহারিণীরূপ পরিগ্রহ করেন। তমো-গুণের আধিক্য-বিশিষ্ট, ইহ-সর্ব্বস্ব, জড়বাদী মনুষ্যগণকেই, আর্য-গুরুগণ দৈত্য, দানব, ও অসুরাদিরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। জ্ঞান ও অজ্ঞান-সম্ভূত সুর ও অসুরাদির অস্তিত্বও নিত্য, এবং ইহাদের সংরক্ষণ ও সংহরণও, সেই নিত্যা-প্রকৃতি ব্রহ্মময়ীর, নিত্যলীলা। এই নিত্য লীলার অনবরোধ-উদ্দেশ্যে, আদি মাতা অঙ্গাবরণ-বিরহিতা অর্থাৎ উলঙ্গিনী, এবং সর্ব্ব বর্ণের আদিত্ব-বিজ্ঞাপক অসিত-বরণী। এই আদিবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বর্ণের প্রকাশক যে সূর্য্য, তাহা শিক্ষিতগণের অবিদিত নহে। (চিত্রে দ্রষ্টব্য)

মানবজাতির বোধ-সৌকার্য্যার্থে, ব্রহ্মের সগুণ-ক্রিয়ার কারণ-স্বরূপ, রজঃ, সত্ত্ব, ও তমোগুণকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বররূপে বিশদ করিয়া

মহামায়া ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ক্রিয়মান,—এই ত্রিগুণের সমষ্টিভূত লীলাটিকে, বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্রে, মহত্তত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। ঐ ত্রিগুণের নির্দ্দেশাত্মক, যথাক্রমে অ, উ, ও ম সংযোগে গঠিত একমাত্র প্রণবের দ্বারা, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া, আর্য্যগুরুগণ উহা সাধারণের বোধগম্য করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড—এই প্রণবই যে ব্রহ্মের স্বরূপ, সমস্ত তত্ত্বের সার এবং ইহাই যে আদি ব্রহ্মমন্ত্র, তাহা সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রে বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রণবের উপরার্দ্ধ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইয়া অব্যক্তে মিশিয়াছে, এবং নিম্নার্দ্ধ, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতম হইয়া ব্যক্ত জগতের, সৃজন পালন ও লয়ের ক্রিয়া, ক্রমানুসারিক-ভাবে প্রকটিত করিতেছে। অণ্ড সদৃশ সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ এই প্রণব, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হওয়ায়, ব্রহ্মাণ্ডের একটি প্রতিকৃতি ও এই চিত্রস্থ প্রণবে, প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিরাট্ আত্মা বা অনন্তদেব—সগুণ ব্রহ্মরূপ মহাকালের অঙ্গের ভূষণ—অনন্তদেবই, সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় পরিক্রমিত এবং কুণ্ডলাকৃতি হইয়া, প্রণবরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। ইনি, আদি পুরুষ ও প্রকৃতিরূপিণী-মহাকাল ও মহাকালীর অংশজ, এবং প্রতি মন্বন্তর-নির্দ্দিষ্ট কালাংশ। ইনি, নাভিকমল-প্রসূত-ব্রহ্মা-সমন্বিত-অনন্ত-শয্যাশায়ী বিষ্ণুর, অনন্তশয্যার আধার। ইনি, সহস্র সহস্র লীলা কল্পনার আধাররূপে, সহস্র সহস্র ফণাবিশিষ্ট। ইনি, চরাচর বিশ্বের চৈতন্য-শক্তিদায়ী, বিরাট্ অহংকার বা আত্মা। ইনিই, গুণ, ধর্ম্ম, শক্তি ও প্রাণ বিশেষে ক্রিয়মাণ হইয়া, এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে, চেতন অচেতন ও উদ্ভিদাদি সমস্ত পদার্থেই, আত্মার অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্ব নামক লীলা-স্থান

হইতেই, ত্রিগুণের সমষ্টিভূত ব্রহ্ম-প্রভেদাত্মক, এই বিরাট্ অহংকার বা আত্মা প্রসারিত হইয়াছেন।

পঞ্চভূত বা অপর-জগৎ—মহত্তত্ত্ব সম্ভূত, এই বিরাট্ অহংকার বা আত্মা হইতে, অবিদ্যা-মায়ারূপ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রথমে ব্যোম বা আকাশের উৎপত্তি হয়। সেই আকাশের কতকাংশ ক্রমে স্থূলীভূত হইয়া, মরুৎ বা বায়ুরূপে পরিণত হন। বায়ুরও কতকাংশ ক্রমে স্থূলীভূত হইয়া, তেজের আধার মহাসূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইলেন। এই তেজও, মরুতের সাহায্যে আকাশস্থ নানা স্থানে নীত ও ক্রমে বিগততেজ হইয়া, এক একটি জলপিণ্ড বা অপ্ রূপে প্রকাশ পাইলেন। পরে সেই জলও ব্যোম, মরুৎ ও তেজের সাহায্যে, ক্রমে আরও স্থূলীভূত হইয়া আমাদের এই পৃথ্বী বা ক্ষিতিরূপে প্রকাশ পাইলেন। এইরূপে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইল। পৃথিবীর উৎপত্তি পর্য্যন্ত অপর-জগৎ-সৃষ্টির বা নিগম-ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইল। ইতঃপর, পর-জগৎ-সৃষ্টি বা আগম-ক্রিয়ার আরম্ভ হইল। নিগম ও আগম শাস্ত্র সমূহে, ইহা বিশেষরূপেই বিবৃত আছে। এই আগম ক্রিয়াকেই আধুনিককালে ক্রমপরিণতি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহাই পঞ্চভূতান্তর্গত সেই বিরাট্ আত্মার, ব্যষ্টি বা সরাট্-রূপে, ঊর্দ্ধগতি বা ব্রহ্মাভিগমন, ইহাই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় রহস্য।

পর-জগৎ—পঞ্চভূত প্রকাশের পর, বিরাট্ আত্মা, আংশিক ভাবে মনঃরূপে পরিণত হইয়া সরাট্ (ক্ষুদ্র) বা বহুমুখীন হইতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে, এক বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডরূপে এক আকাশ, এক বাতাস, এক তেজ, এক জল ও এক পৃথিবী ছিল একণে সরাট্ ও বহু হইয়া, ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ অসংখ্য অসংখ্য জীবে, পৃথিবী পূর্ণ হইতে লাগিল। সগুণ ব্রহ্ম এইরূপেই "একোহং বহুঃ স্যাম্" বাক্যের সার্থকতা করিলেন; এইরূপে

পর-জগৎ প্রকাশ পাইলেন। ইহার ফলে, প্রথমে অপরিস্ফুট-মন-বিকাশ, ও পৃথকানুভূতি বিশিষ্ট, উদ্ভিজ্জ জীবের সৃষ্টি হইল।

পৃথিবীস্থ জীব সমষ্টিকে, আর্য্যগুরুগণ, চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা:—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। পূর্ব্বোক্ত ক্রমপরিণতির ক্রিয়ানুসারে, চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া সম্রাট্ আত্মা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাও আর্য্যশাস্ত্রের উক্তি। আর্য্যশাস্ত্রে উক্ত আছে:—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং স্বেদজংনবলক্ষকং।
কূর্ম্মাশ্চ রুদ্রলক্ষঞ্চ, দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণাম্॥
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চক্ষুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততোমনুষ্যতাম্প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

——উদ্ভিজ্জ বিশলক্ষ, স্বেদজজীব নবলক্ষ, অণ্ডজজীব—মৎস্য, কূর্ম্ম, পক্ষি, পতঙ্গাদি লইয়া—বাইশ লক্ষ, এবং জরায়ুজ জীব—বরাহ হইতে বানরাদি নৃসিংহজাতি—তেত্রিশ লক্ষ, তাহার পরে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয়। তৎপরে কর্ম্ম-সাধনা আরম্ভ হইয়া থাকে।

ন্যূনাধিক ষাট বৎসর পূর্ব্বে, মহাত্মা ডারউইন (১) যে বিবর্ত্তবাদ প্রচার দ্বারা পাশ্চাত্য-জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর্য্য-ঋষিগণ প্রচারিত ক্রমপরিণতি তত্ত্বের আংশিক জ্ঞান মাত্র। কারণ, ডারউইন প্রথমে বানর হইতে মানুষ, ইহাই আবিষ্কার করেন; পরে শম্বূক হইতে মানুষ হইয়াছে, ইহা প্রকাশ করেন। ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্র মতে এই নিগম ও আগম ক্রিয়া, কিরূপ ন্যায় ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে

(১) Charles Darwin, the celebrated naturalist of the last century.

প্রকটিত, তাহা পাঠক অনুধাবন করিবেন। (১) ইহার অধিক ডারউইন যাইতে পারেন নাই। যাহাহউক ভারতীয় আর্য্যঋষিগণের আবিষ্কৃত এই প্রাচীন ক্রমপরিণতি তত্ত্ব, ডারউইন, হেকেল (২) আদি আধুনিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়; ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

উদ্ভিজ্জজীব—ক্ষিতিতে, ব্যোম, মরুৎ তেজঃ ও অপ্ সংক্রমিত হইলে, অর্থাৎ কোন উন্মুক্ত স্থানে মৃত্তিকার উপর যদি কিঞ্চিৎ জল পড়িয়া থাকে, তাহাতে স্বাভাবিক নিয়মে যে শৈবালাদির উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। তথায় এই শৈবালাদির উৎপাদনকারী বীজের, কোন আবশ্যকতা থাকে না। * যদি Germs বা জীবাণু ইহার কারণ হয় তবে, পরমাণু দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু আদিই তৎপক্ষে দর্শন শাস্ত্রে আত্মা বলিয়া প্রমাণিত আছেন, তাহা শিক্ষিতগণ অবিদিত নহেন। বিরাট্ আত্মাই তখন, আদি জীবরূপ ধারণ করিয়া সরাট্ হইলেন। ঐ সকল শৈবালাদি ক্রমপরিণতিবশে, কালক্রমে তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষাদিরূপে শোভিত হইয়া, প্রাণ ও মনের কথঞ্চিৎ বিকাশাবস্থা-বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ-জীব-জগতের প্রকাশ করিল।

স্বেদজজীব—বৃক্ষলতাদিচ্যুত পত্র পুষ্পাদি, ঈষৎ জলাভিষিক্ত স্থানে পতিত ও সেই জল পর্য্যুষিত হইলে, তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাদির উৎপত্তি হয়, তাহাও সকলে দেখিয়া থাকিবেন। অধিক কি, একটি শিশিতে জল রাখিয়া, ছিপি দ্বারা তাহার মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া, রাখিয়া দিলে, কালক্রমে তাহাতেও বীজ ব্যতিরেকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি

---

(১) Man is the evolution of the mollusk.

(২) Prof Haeckel.

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বীজ, পঞ্চভূতস্থ বিরাট্ আত্মাতেই অণু-পরমাণুরূপে অবস্থিত। আর্য্যশাস্ত্র এই শ্রেণীর জীবকেই স্বেদজ, অর্থাৎ পর্য্যুষিত জলজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (চিত্রে দ্রষ্টব্য)

ইহাই, প্রকৃতপক্ষে চলন-শক্তিমান্ জীবের প্রথম উৎপত্তি। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই বৃত্তি-চতুষ্টয়ের অধীন, এবং সরাট্ অহংকারে অহঙ্কৃত হইয়া, প্রাণ ও মনের ক্রিয়া অধিকাংশে প্রকাশপূর্ব্বক, আত্মা স্বীয় বিরাট্ত্ব ভুলিয়া, সরাট্ ও বহু হইলেন। এক্ষণে সেই সগুণ ব্রহ্মই যে নিজ লীলাবশে, উক্ত কীটাদিরূপে পরিণত, এবং কদর্য্য ক্লেদ-পুরীষাদিতে মগ্ন হইয়া, তদ্বৎ আহার্য্যে আনন্দিত ও লীলারত হইলেন; ইহা বলাই বাহুল্য। আর্য্যগুরুগণের "যত্র জীব তত্র শিব" এই উক্তি এই স্থানেই প্রমাণিত হয়।

ক্রম-পরিণতিবশে, এই স্বেদজ জীবও মানসিক এবং দৈহিক অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ব্রহ্মের যে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, পঞ্চ-ভূতাদিক্রমে বিরাট্ জগত সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ইচ্ছাশক্তি পঞ্চভূতস্থ আত্মায় সংক্রমিতা ছিলেন। এক্ষণে জীব-জগতে তাহার বিকাশ হইতে চলিল। মানসিক প্রবৃত্তিরূপে, সেই ইচ্ছাশক্তিই জীব-জগৎকে কর্ম্ম-মার্গে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। স্ব স্ব প্রবৃত্তিবশে কর্ম্ম করিতে করিতে, এই ক্ষুদ্র দেহী জীব-সমষ্টি, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপনীত হইয়া ক্রমপরিণতি সাধন করিতে লাগিল।

অণ্ডজজীব—এইরূপে স্বেদজ জীবগণ, ক্রমে অপর্য্যাপ্ত জল হইতে পর্য্যাপ্ত জলে বিচরণশীল হইয়া, মৎস্যরূপে পরিণত হইল। মৎস্য, স্বেদজ কীটগণের পরিণতি এবং পুরাণের আদি অবতার। এই মৎস্য-জাতিই সর্ব্ব প্রথমে অণ্ড প্রসব করিয়া, জীব হইতে জীবোৎপত্তির বিকাশ করিল। মৎস্যজাতীয় জীবের কতাকাংশ, কালক্রমে জল ও স্থল, উভয়েই

বিচরণশীল হইয়া, রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। ইহাই পুরাণের কুর্ম্ম অবতার। কালে এই শ্রেণীর জীবও, অধিকতর স্থল-বিচরণ প্রিয় ও রূপান্তর-প্রাপ্ত হইয়া, পুনশ্চ এক ক্রম-পরিণতি সাধন করিল।

জরায়ুজীব—ইহাই পুরাণে বরাহ-অবতার। এই শ্রেণীর জীবই প্রথম জরায়ুজ জীবের উৎপাদনকারী হইল। পরে জরায়ুজ জীব শ্রেণীই ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে, সিংহ, ব্যাঘ্র, রাক্ষস, বনমানুষ, বানর ইত্যাদি জীবের উৎপত্তি হইল। পুরাণে এই সময়ে নৃসিংহ-অবতার। ইহার পরে অপূর্ণ মনুষ্যাকৃতি জীবের উৎপত্তি। পুরাণে এই সময়ে বামন-অবতার। ক্রমে পূর্ণাবয়ব মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হইল। এই সময়ে পুরাণের পরশুরাম-অবতার। ইহার পর রাম। ইনি প্রেমের অবতার, সর্ব্বজীবে সমদর্শী, সর্ব্বগুণান্বিত, মনুষ্য-সম্প্রদায়ের গুরু ও সংঙ্ঘবদ্ধ মনুষ্য-সম্প্রদায়ের উপর, সুবিচার-পরায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পর বলরাম। ইনি মনুষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের গুরু। তৎপরে বুদ্ধ ইনি জগৎস্থ জীব সমষ্টির উপর, প্রেম প্রতিষ্ঠার গুরু। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মহা-সত্যের প্রচার করিয়া, মনুষ্যের হিংস্র-বৃত্তিকে দূরীকরণ পূর্ব্বক, ইনিই মনুষ্যজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যখন একেবারে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইবে, তখন কল্কি আসিবেন, শাস্ত্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ ক্রম, পরিণতি, বহু বহু বার হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা শ্রীভগবান্ শ্রীমদভগবদ্গীতায় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

মানবজাতি—এক বিরাট আত্মা, আংশিকভাবে মনঃরূপে পরিণত হইয়া, সেই এক বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড হইতে যে, বহু ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডরূপী জীব-জগৎ গঠন করিলেন ; ক্রম পরিণতিবশে চুরাশীলক্ষ যোনি অতিক্রম

করিয়া, মানব জাতিতেই সেই মনের অধিকতর পরিস্ফুটতা প্রকাশ পাইল। পশু, পক্ষি, কীট পতঙ্গাদি জীবগণ,—তাহারা নিজে কি ? এ জগৎ কি ? এবং এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাই বা কে ?—এ সকল চিন্তা করিতে পারে না ; তাহারা কেবল আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া, আনন্দ অনুভব করে মাত্র। কিন্তু মানবজাতি, মনের অধিকতর বিকাশাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, নিজেকে নিজে চিন্তা করিতে পারিল ; এই চরাচর বিশ্ব যে কি, তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিল ; এবং অহং-ত্বং-সমন্বিত এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাই বা কে, তাহা অনুসন্ধান করিতে আগ্রহান্বিত হওয়ায়, সেই মন হইতে এক্ষণে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পরে সেই বুদ্ধি হইতে চিত্তের উদ্ভব হইল। বুদ্ধির অনুসন্ধানাত্মিকা-বৃত্তির, সিদ্ধান্ত-কৃত বিষয় সকল, সেই চিত্তে চিত্রিত হইয়া সংস্কাররূপে, মানুষকে আবদ্ধ করিতে লাগিল।

এক্ষণে বিরাটোদ্ভূত সেই সরাট অহংকারই, মন, বুদ্ধি ও চিত্তরূপে প্রসারিত হইয়া, সংস্কারবশে, এবং ইচ্ছা-শক্তিরূপিনী প্রবৃত্তির নিয়োগে কর্ম্ম-জগতে অবতীর্ণ হইলেন। মনুষ্যত্বের পশ্বাদি জাতিতে, এই অহংকার, মন-বুদ্ধি ও চিত্ত অপরিস্ফুট ভাবেই বিদ্যমান ছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

এই রূপে সরাট, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, প্রভেদ-জ্ঞান-বিশিষ্ট, জীবাত্মা সকলের মধ্যে, মানবজাতিই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় অহংকার মন, বুদ্ধি, ও চিত্তের সাহায্যে, তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, বিশ্বপ্রকৃতির পাঠশালায় পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিল।

বেদাদি ও শাস্ত্রের উদ্ধার—প্রথমে তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া, তত্তৎবাচক অ, উ ও ম, সংযোগে গঠিত, একমাত্র প্রণব মন্ত্রের দ্বারা জগৎকর্ত্তার উপাসনা করিতে লাগিলেন।

এবং ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। পরে মহাতেজোময় দিবাকর সূর্য্যের জগৎ-প্রকাশিকা, এবং তেজ, চৈতন্য ও কর্ম্ম প্রদায়িনী ক্রিয়া প্রত্যেক্ষ করিয়া, পরম পবিত্রা গায়ত্রী-মন্ত্র সহযোগে, তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিলেন। তৎপরে দিবা রাত্রি সন্ধ্যা ও প্রত্যূষ এবং পঞ্চভূতস্থ সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তি ও ঋতু বিশেষে তাহাদের পরিবর্ত্তন সমূহ, পর্য্যালোচনা করিয়া, সেইসৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা অবলোকন পূর্ব্বক, তাঁহারই:এক এক প্রতিনিধি-স্বরূপ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইত্যাদি দেবতা-গণেরও উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নিগম শাস্ত্র বা বেদের উদ্ধার, অথবা প্রকাশ আরম্ভ হইল। এইরূপে প্রথমে প্রণব, তাহার পর গায়ত্রী এবং তাহার পর বেদ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। আর্য্যশাস্ত্র এইজন্য, ব্রহ্ম-উপাসনা মন্ত্র প্রণবকেই আদি এবং গায়ত্রীকে বেদমাতা বলিয়া বারবার উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রমে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী জীবাত্মার সহিত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপী পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সুমীমাংসিত হইয়া যখন ব্রহ্মনিষ্পাদিত হইলেন তখন, সেই সমস্ত জ্ঞান, সাম, যজু, ঋক্ ও অথর্ব্ব নামে, বিশ্বের সর্ব্ব কার্য্যকুশল পূর্ণাবয়ব বেদরূপে প্রকাশ পাইলেন। উক্ত জীবাত্মা, জগৎ ও ব্রহ্ম যখন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত ও সুমীমাংসিত হইলেন, তখন উক্ত ত্রয়ের একত্ব প্রতিপাদক বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র, মায়াবাদ প্রকাশ পূর্ব্বক, মহামায়া, অবিদ্যামায়া ও বিদ্যা মায়ারূপে বিভাগ করিয়া, নির্ণীত ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের পন্থা, অধিকতর সুগম করিলেন। ইদানীং কালের বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্র সকল এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। ভারতীয় বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে, প্রাকৃতিক-তত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের, বিজ্ঞান এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত, যে গভীর আলোচনা ও সুমীমাংসা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার নিকট সমস্ত জগৎ যে চিরতরে কৃতজ্ঞ থাকিবে,

ইহা নিশ্চয়। ব্রহ্ম-নিষ্পাদন-সমন্বিত উক্ত তত্বসমূহের সুমীমাংসা এবং সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্তির সুগম পন্থা, যেমন ভারতীয় শাস্ত্র সমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে, পৃথিবীস্থ আর কোন দেশের শাস্ত্রেই, বোধ হয় সেরূপ হয় নাই।

এতদ্বিষয়ে, জগৎবিখ্যাত কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত ও প্রদর্শিত হইল :—

"In the whole world there is no study so benificial and soelevating, as the Upanishad. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death. If these words of schopenhaur required any endorsemeut, I should willingly give it as the result of my own experience during a long life devoted to the study of many philosophies and many religions"—Max Muller.

"When we read with attention the poetical and philosophical movements of the East, above all those of India, which are beginning to spread in Europe, we discover there many a truth, and truths so profound, and which make such contrast with the meanness of the result at which European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East and to see in the cradle of the human race the native land of the highest philosophy"—Victor Cousin.

Even the loftiest philosophy of the Europeans, the idealism of reason, as it is set forth by the Greek philosophers, appears in comparison with the abundant light and vigour of Oriental idealism like a feeble Promithean spark in the full flood of heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished."—Frerdrich Schlegee.

"In our main conclusion we have long ago been anticipated by the religious philosophy of India. In the west our philosophy has been surely but slowly moving to the same inevitable monistic goal. In Professor Ladd of Harvard we have a notable western thinker who by a process of careful and consistent reasoning, concrete in character, has also arrived at the conclusion that the ultimate Reality must be conceived of as an Absolute Self of which we are finite ferms and appearances.

But it is the crowning glory of the Vedanta that it so long ago announced, re-iterated and emphasized this deep truth in a manner that does not permit us for a moment, to forget it away. This great stroke of identity, this discernment, of the ultimate unity of all things in Brahman or the one Absolute Self seems to us to constitute the masterpiece and highest achievement of India's wonderful metaphysical and relegious genius to which the West has yet to pay the full tribute which is its due.—J. H. Tuckwell.

চতুর্বর্ণের উৎপত্তি—জগংস্থ বিভিন্ন-প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবজাতি, এইরূপে ক্রমপরিণতি প্রাপ্ত ও তত্বানুসন্ধানশীল হইয়া. ক্রমে জগতের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন। দেশ, কাল ও পাত্র বিভেদে, অনুরূপশিক্ষানুযায়ী স্ব স্ব প্রবৃত্তিমতে কর্ম্মমার্গ আশ্রয়পূর্ব্বক, যাঁহারা এই সমস্ত তত্ব নিরূপণ করিয়া, জীবহিতার্থে তাহা শাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ করিলেন,—এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, অপর সাধারণের পূজ্য হইতে লাগিলেন। এই সময়ে যে কেবল ব্রহ্মবিদ্যা ও জ্ঞান আলোচিত

হইল, তাহা নহে,—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের, ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ফলে, জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়া প্রকাশ করিলেন "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্" ; এবং আরোগ্য বিধানের জন্য গ্রহশান্তিরূপ মানস-যজ্ঞ ও রসায়ন শাস্ত্র-সম্মত বহু ঔষধাদি, আবিষ্কৃত হইল। সঙ্গীত-শাস্ত্রাদি চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যা এবং শিল্প-বিদ্যাদির আবির্ভাব হইল। ব্রাহ্মণেরাই প্রধানতঃ এ সকল বিদ্যার যাজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। ইহারাই আমাদের শাস্ত্রকথিত মুনি এবং ঋষি।

যাহারা এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল-কর্ম্মের উপযুক্ত, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, দেশ ও মানবজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, সমাজ ও যুদ্ধনীতি, ইত্যাদি শাস্ত্র ইঁহারা অবলম্বন করিলেন। যাঁহারা এতদপেক্ষা স্থূলতর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা পশু-পালন, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পাদি কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, বৈশ্য অভিধা প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধি বৃত্তির অপ্রাচুর্য্য-হেতু অবশিষ্ট যে সমস্ত মানব-সমাজ, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহ সম্পাদনে, সাহায্য-করণরূপ স্থূলতম কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা শূদ্রবর্ণ বলিয়া কথিত হইলেন। বুদ্ধি বৃত্তির অপ্রাচুর্য্যহেতু কেবল শূদ্রবর্ণের বেদে অধিকার রহিল না।

জগতের সর্ব্বজনাদৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে উক্ত আছে :—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

(অষ্টাদশ অধ্যায়)

আদি মানবজাতি এইরূপে কর্ম্মানুসারে চতুর্বর্ণে বিভক্ত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, চতুর্বর্গ-লাভ উদ্দেশে জীবনযজ্ঞে ব্রতী হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চতুর্বর্গের মধ্যে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি ভোগ্য বিষয় এবং মোক্ষে ত্যাগ। ব্রাহ্মণগণ, সাধারণতঃ ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া, ত্যাগকেই বরণ করিয়া লইয়া, এই সাধনার গুরুরূপে নিযুক্ত রহিলেন এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভোগ ও ত্যাগ এই উভয়েরই সাধনায় রত হইয়া, এবং নিস্বার্থপর সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে সেবা ও পূজা করিয়া, সহজে প্রেম ও ভক্তি লাভপূর্ব্বক, সকলেই ভোগ ও ত্যাগ-বৃক্ষের ফলস্বরূপ চতুর্বর্গ লাভে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্বর্ণই পরস্পর প্রেম ও ভক্তিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, সকলেই অভাবশূন্য অবস্থায়, সন্তুষ্টচিত্তে, এবং নির্ব্বিরোধভাবে, স্ব স্ব কর্ম্মপথের পথিক হইলেন।

আধুনিক কালের ব্রাহ্মণ-নামধারী মানবগণের বহুলাংশ, কালের অনিবার্য্য গতিতে, ব্রহ্মজ্ঞানহীন, স্বার্থপর, ও বিলাসভোগী হইলেও, প্রাগুক্ত বৈদিক সময় হইতে, পাশ্চাত্য সভ্যতালোক প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জীব-হিতার্থী, চতুর্বর্গ-সিদ্ধ, ও ত্যাগী ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদের সাধনলব্ধ যে সার্ব্বজনীন প্রেম, মানবজাতির উপর বিস্তার করিতেন, তাহার ফলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণত্রয়, ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামের ভোগে পরিতৃপ্ত এবং

মোক্ষপথে অগ্রসর হইয়া, সর্ব্বদা শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ হইয়া থাকিতেন। এই হেতু বর্ত্তমানকালে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কচিৎ দৃষ্ট হইলেও, ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্তও সেই নামে বিকাইতেছেন, এবং ত্রিবর্ণের নিকট কথঞ্চিৎ ভক্তি লাভও করিতেছেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি—সেই কালের লীলাতেই কালক্রমে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বিলাস-ভোগী, বিত্তশালী ও ধনসম্পদাদি লোলুপ হইয়া, নানাস্থানে বিচরণশীল হইয়া পড়িলেন। ক্রমে মোক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লৌকিক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ভোগে তৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হারাইলেন। ভোগী ত্রিবর্ণগণ এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা ও বেদ ভুলিয়া ক্রমে প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য দেশে, বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। (১) পুনরায় তাঁহারা আদি আর্য্যজাতির ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবিশিষ্ট হইয়া, কালক্রমে পুনঃ ব্রহ্মাজিজ্ঞাসু হওয়ায়, সেই সমস্ত সংঘ হইতে মহাত্মা সকলের আবির্ভাব হইতে লাগিল। ইঁহারাই জোরাষ্টাশ, খৃষ্ট, মহাম্মদাদি নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক।

প্রাচ্যে, তথা ভারতে, সেই আদি আর্য্যধর্ম্ম, ব্রহ্মাণাদির দ্বারা রক্ষিত ও প্রচলিত থাকিলেও, ভোগ-বাসনার আক্রমণে এই সময়ে তাহাতেও কিঞ্চিৎ গ্লানি উপস্থিত হয়; এবং শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধাদি ভগবানপ্রমুখ অবতারগণ দ্বারা সেই গ্লানি দূর হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণও সাময়িক গ্লানি দূর করেন।

ভারতে সেই আদি আর্য্যধর্ম্মই প্রচলিত রহিল, কিন্তু নবোদ্ভাবিত পাশ্চাত্য ধর্ম্মমণ্ডলীতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ঘটিয়া গেল। দেশ ভেদে আহার, ও আচার ব্যবহারাদির বৈপরীত্য হওয়ায় ইঁহারা ক্রমে সাত্ত্বিকগুণ-ভ্রষ্ট এবং

(১) দ্বাপর যুগের শেষাংশে রাজা যযাতির সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল তাহা পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

তামসিক গুণের আধিক্য বিশিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাহার ফলে, যোগমার্গ-চ্যুত হইয়া, তাঁহাদের অধ্যাত্ম-জ্ঞান সঙ্কুচিত হইয়া গেল। এই হেতু নবধর্ম্মমণ্ডলীগুলিতে পারলৌকিক জ্ঞান ও পুনর্জ্জন্মবাদ, অমীমাংসিত হইয়াই রহিল। শ্রুতি, স্মৃতি, আদি শাস্ত্র কথিত পুনর্জন্ম-তত্ত্ব ভুলিয়া, ইঁহারা ক্রমে ইহসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলেন। আধুনিক সভ্যতাদৃপ্ত ইউরোপাদি দেশ, এই সময়ে অরণ্যাচ্ছাদিত ও পূর্ব্বোক্তরূপ অজ্ঞান ও অসভ্য মানবের বাসভূমি ছিল। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের মধ্যকাল পর্য্যন্ত উক্ত দেশসমূহে প্রকৃত জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মজ্ঞানহীন হিংস্র-স্বভাববিশিষ্ট এই সকল মানবজাতিকেই আর্য্যঋষিগণ দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই অনেক সময়ে আদি আর্য্যজাতির উপর পতিত হইয়া, অমানুষিক অত্যাচার ও উপদ্রব করিতেন।

ভারতের, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, শাসননীতি, সমাজনীতি ও শিল্প, বাণিজ্যাদি ব্যবহারনীতিও ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে গঠিত, কিন্তু ইহাঁদের দেশের ধর্ম্মনীতি, এক কোণে পড়িয়া থাকায় অন্যান্য নীতিশাস্ত্র স্ব স্ব প্রধান; ধর্ম্মের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ইহাঁদের যুদ্ধনীতির সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ না থাকায় অত্যাচার উপদ্রব পরপীড়ন ও পরস্বাপহরণই ইঁহাদের যুদ্ধনীতি ছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইলে, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে ইহাঁদের দ্বিধাবোধ হইত না। ইহারা সম্মুখ যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, অলক্ষিতে যুদ্ধ করা, কৌশল, ছল, ও উৎকোচ প্রদানাদি দ্বারা পররাজ্য অপহরণ করা ইহাদের রীতি ছিল।

ভারতের পুরাতত্ত্ব—ভারতবর্ষ কিন্তু সেই স্মরণাতীত বৈদিক কাল হইতে মনুষ্যত্ব, সভ্যতা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যানুশীলনে চির-

দ্বাপরের শেষাংশে, অনিবার্য্যকাল মাহাত্ম্যে, আর্য্যধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভাব কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এই সময়ে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের দ্বিপাদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। এই সময়েই বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই নবধর্ম্মগুলি, ইহসর্ব্বস্ব-জ্ঞান-বিশিষ্ট এবং ছল, বল, ও কৌশলে ধর্ম্ম-প্রচার বা রাজ্য বিস্তার করা এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিধান। এই সকল ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে নাই; কিন্তু ভারতীয় আর্য্যজাতির সার্ব্বজনীন ভাবের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। অধ্যাত্ম জ্ঞান ও পারলৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত নবধর্ম্মগুলিতে বিশেষ কোন আলোচনা বা সুমীমাংসা হয় নাই। দেহান্তে জীবাত্মার যে অবস্থার কথা এই সকলধর্ম্মে বর্ণিত আছে, তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত হইতেই পারে না। জন্মান্তরবাদ এ সকল ধর্ম্মে অমীমাংসিতই আছে।

গৌরবান্বিত। "গ্রীক্ পণ্ডিত পিথাগোরাস্ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে আগমন পূর্ব্বক তক্ষশীলার জগৎ বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সাংখ্যদর্শন শিক্ষা করেন, এবং স্বদেশে গমন করিয়া দর্শন শাস্ত্রের মূলভিত্তি স্থাপনা করেন। শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ জগতে রাজনীতি শাস্ত্র প্রথম রচনা করেন বলিয়া খ্যাতি আছে। পরে মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে, তদীয় মন্ত্রী চাণক্য, পূর্ব্ব প্রচারিত তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া, খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে অর্থ-শাস্ত্র নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই যুগে সুপ্রসিদ্ধ সমাজ সংস্থাপক বাৎসায়ন ঋষি ভারতবর্ষে অর্থ-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব প্রচার করেন। এইযুগে ভারতবাসীগণ, দেশীয় জাহাজে চড়িয়া চীন, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আরব ও গ্রীসাদি দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং এতদুপলক্ষে তাঁহারা নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। লঙ্কাদ্বীপ, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, বর্ণিয়োদ্বীপ ও অন্যান্য প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা ও ভারতীয় আর্য্যগণ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই, করিয়া আসিতেছেন। সূর্য্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন গতি এবং তাহার দিন, ক্ষণ ও সময় নির্দ্ধারণ ও নক্ষত্রাদি গণনা অতি প্রাচীন কালেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শুদ্ধরূপে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ হেতু, ব্যাকরণ, এবং যজ্ঞের বেদী নির্ম্মাণ এবং স্তুপ, বিহার, চৈত্য, গুহাদি নির্ম্মাণ জন্য জ্যামিতি শাস্ত্র গঠিত হইয়াছিল। অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহারা অদ্বিতীয় ছিলেন। আজকাল যে দশমিক গণনা, সর্ব্বত্র প্রচলিত, ইহা তাঁহারাই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক আদি আর্য্যজাতির সনাতন ধর্ম্মে, ঐ সকল তত্ত্বের সুমীমাংসাপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা করা যায় না। এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় ও তন্নির্দ্দিষ্ট সাধনায় মানুষ আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে দেবত্ব ঈশ্বরত্ব এবং পরিশেষে ব্রহ্মপদ বা নির্ব্বাণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন।

সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের ইহাই বিশিষ্টতা। অপরাপর ধর্ম্ম জীবাত্মার দেহান্তে ঈশ্বরের নিকট কৃতকর্ম্মের বিচার-ফল প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। তাহাও কাল্পনীক ভাবে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে নহে। সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এ সকল ধর্ম্মের প্রচারকগণ তত্তৎদেশের মনুষ্যসমাজের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াই, তাঁহারা সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা বিশেষভাবে করেন নাই; কারণ, সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ, সেই সকল মনুষ্যজাতির ধারণাশক্তির আয়ত্তীভূত হইত না।

৩২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিত্তা, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বরাহমিহির, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত রোমকসিদ্ধান্ত ও পুলিশসিদ্ধান্ত নামক পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই—পৃথিবী যে প্রত্যহ নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছে, তাহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ধন্বন্তরি, অত্রি, হারীত প্রভৃতি ঋষিগণ সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন; তাহার পূর্ব্বে চিকিৎসা-তত্ত্ব নানা ভৌতিক ক্রিয়ার সহিত মিশ্রিত ছিল। ইঁহাদের পর চরক ও সুশ্রুতের অভ্যুদয় হয়। চরকে ঔষধ ও পথ্যের এবং সুশ্রুতে অস্ত্র চিকিৎসারওবিধান আছে। এই সময়ে ১২৭ প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। বসন্তরোগ নিবারণার্থ টীকা দেওয়া, ভারতে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য, বীজগণিত, লীলাবতী ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময়ে আবিশিনিয়া, মিসর, জাপান প্রভৃতি দূরদেশেও বাণিজ্য চলিত।"

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ, বি, এ, মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

ভারতের অবনতির ঐতিহাসিক তত্ত্ব—পূর্ব্বোক্ত বৈদিক কাল হইতে, এ পর্য্যন্ত ভারত, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গে সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত ও বৈদেশিক দিগের নিকট স্বর্ণভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল। প্রাকৃতিক ধনরত্নাদি ও সৌন্দর্য্যের আধারভূমি ভারতের নাম, পৃথিবীর সকল দেশেই শ্রুত হইত। দ্বাপরের শেষাংশে

তাহারা নিজ নিজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধমতেরই পোষণ করিত। যদি কোন সত্য ও সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রচার হইত, তাহা হইলে প্রায়ই প্রচারকদিগকে নিগৃহীত, নির্য্যাতিত বা নিহত হইতে হইত। মহাত্মা মহম্মদ ও খৃষ্টাদিই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাত্মা মহম্মদ এই কারণেই ঐ সকল পাশব প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট মানবসমাজের উপর "অস্ত্র বলে ধর্ম্ম প্রচারের" বিধান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যে, ঐ সকল ধর্ম্ম প্রচারকগণের মহিমায়, এবম্বিধ মনুষ্যসমাজও, (ন্যায়-বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, চির নরকে, বা স্বর্গেই হউক,) অন্ততঃ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

জন্মান্তরবাদ—দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, জীবাত্মার জন্মান্তর-পরিগ্রহ, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক বিরাট্ আত্মাই বহু ও সরাট্ হইয়া ক্রমপরিণতিবশে চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ

ভারতে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল; যথা, "দ্বাপরে রাজ্যবিস্তরঃ।" এই সময় হইতে কালের মহিমায়—ভোগ বিলাসের আক্রমণে, এবং সাধনার ন্যূনতায়, সার্ব্বজনীন প্রেম ও ধর্ম্মমূলক ব্রহ্মজ্ঞান সঙ্কুচিত হইতে থাকে; এবং সাম্প্রদায়ীকতার আবির্ভাব হয়। ইহার ফলে ভারতীয় আর্য্যজাতি স্ব স্ব প্রধান হইয়া একচ্ছত্রিত্ব হারাইয়া ফেলেন—ক্রমে ঈর্য্যা-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, পরস্পর অন্তর্বিগ্রহে রত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে মাত্র দশ জন জীবিত ছিলেন। প্রনষ্ট একচ্ছত্রিত্ব স্থাপনার উদ্দেশ্যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রমাণ পূর্ব্বক যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর সেই একচ্ছত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনূ্যন ৪০০০ সহস্র বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে আবার তাহা বহু বিভক্ত, ও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠে, এবং বিদেশীয়গণ এই সময়ে, ভারত আক্রমণের সুযোগ পান। বিদেশীয়গণের আক্রমণে ভারতীয় আর্য্যগণ এ সময়ে, একচ্ছত্র তলে সমবেত হইয়া বহিঃ শত্রু দূর করিতেন সত্য, কিন্তু কালক্রমে সে ভাবও তিরোহিত হয়। অহমিকা-বশে ঈর্ষা, দ্বেষে প্রমত্ত হইয়া কেহ কেহ বিদেশীয়গণের প্ররোচিত কুপথ আশ্রয় করিলেন, এবং তাহাদের প্রলোভনে ভুলিয়া, তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। বিদেশীয়গণ এই সময়ে ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনাশে, কেহ বা বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে গমনাগমন করিতেন। তাঁহারাও ভারতের সামরিক অন্তর্বিগ্রহ ও দুর্ব্বলতা দর্শনে জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতের দিকে

করিয়া যে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা বার বার উক্ত, প্রমাণিত ও ও চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ও উহা স্বীকৃত হইতেছে। মানবসাধারণের বোধ সৌকার্য্যার্থে, আর্য্য-গুরুগণ, জীবদেহের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের বিভাগ প্রদর্শন করিয়া, আত্ম-জ্ঞানলাভের পন্থা সুগম করিয়াছেন। ঘটমধ্যস্থ-আকাশের ন্যায়, এক অদ্বিতীয় বিরাট্ আত্মার দেহভাণ্ডস্থ অংশই, অবিদ্যামায়া প্ররোচিত অহংকার, মন বুদ্ধি ও চিত্তরূপে সূক্ষ্ম শরীর; ও পঞ্চভূতাত্মক দেহভাণ্ডই স্থূল শরীর। বহু-ভাণ্ড-মধ্যস্থ আকাশ যেমন এক এবং অখণ্ডনীয়, সেইরূপ চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদাদি সকল পদার্থের অন্তর্গতঃ আত্মাও, এক অখণ্ডনীয়, এবং বিরাট্। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই চৈতন্যময়, প্রকৃতপক্ষে অচেতন বা জড় এ জগতে কিছুই নাই। স্থূলদৃষ্টিবশতঃই আমরা সাধারণতঃ পঞ্চভূতাত্মক পদার্থকে জড় এবং বর্দ্ধনশীল ও

আগমন ও অত্যাচার উপদ্রব করিতে লাগিলেন। ইহারা সিন্ধুনদের পূর্ব্বপ্রান্ত বাসী আর্য্যগণকে সিন্ধুশব্দের অপভ্রংশ হিন্দু আখ্যা প্রদান ও ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান নামে অভিহিত করেন বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাহা ভ্রান্তমত। প্রাচীন পারশ্যজাতির হনদ্ শব্দ হইতে ক্রমে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, পারশ্য ভাষায় হনদ্ শব্দ "গৌরান্বিত" অর্থের বাচক গৌরান্বিত ভারতকে, তদানিন্তন পারশ্য জাতি হনদ্ আখ্য প্রদান করেন। তৎকালিক ভারতের সীমা, হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কুশ শব্দ ইহুদীদের ভাষায় পর্ব্বত বোধক "হিন্দুকুশ" গৌরবান্বিত দেশের সীমাস্থ পর্ব্বত, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। এই বিদেশীয়গণ বহুবার ভারতের উপর আক্রমণ ও অমানুষিক অত্যাচার করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্মীভূত করেন, শিল্প, বাণিজ্য ও স্থাপত্যবিদ্যাদির উন্নতিকারী বহু স্থান ধ্বংস করেন। এইরূপে তাঁহারা স্বার্থ ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, ভারতীয় ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যাদির বহুল ক্ষতি সাধন করিয়া ক্রমে ভারতকে আরও হীনবল করিয়া ফেলেন। ক্রমশঃ স্থানে স্থানে অধিকার স্থাপন পূর্ব্বক পরে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদেশীয়গণের মধ্যে প্রথমে গ্রীক্‌গণ, ভারতাগমন পূর্ব্বক ভারতীয় ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া, স্বদেশের উন্নতি সাধন করেন। কালক্রমে ম্যাসিডনিয়ার অধিপতি গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং ভারত আক্রমণ করিয়া, পঞ্জাব প্রদেশে প্রথমে রাজ্য বিস্তার করেন। আলেকজাণ্ডারের

চলন-শক্তিবিশিষ্ট সম্বিৎকেই চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করি। মানব-জাতির বোধ সৌকার্য্যার্থেই শাস্ত্রে, এই বিভাগ কল্পিত হইয়াছে।

যে পঞ্চভূতকে আমরা জড় বলিয়া কল্পনা করি, জ্ঞানদৃষ্টিতে ইঁহারা মহান্ চৈতন্যময়। আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া সে চৈতন্য অনুশীলন করিতে পারি না। যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারাই এ জগতে নানা বিষয়ের আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়া যান। জৈব-সম্বিৎ, পঞ্চভূতস্থ-সম্বিতের অংশ মাত্র। পঞ্চভূতস্থ সম্বিতের গুণ ও ধর্ম্ম লইয়াই জীবজগৎ জীবিত আছে। তাহাতেই জীবের ক্ষুধা, তৃষ্ণা মিটিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, এবং আনন্দ অনুভব হইতেছে। পঞ্চভূতও চলন-শক্তি মান্ এবং বর্দ্ধনশীল। জল, বায়ু ও তেজের স্রোত আছে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসকল নিজ নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছেন। ধরাধর পর্ব্বত সকলের বৃদ্ধি আছে, পৃথিবীর নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন আছে। ষড়্ঋতুর ক্রমাবির্ভাব

মৃত্যু হইলে, বিজিত পাঞ্জাব প্রদেশ তদীয় সেনাপতি সেলুকাসের হস্তগত হয়। এই সময়ে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের জন্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলুকাসের যুদ্ধ হইলে, সেলুকাস পরাজিত হইয়া, আপন কন্যা হেলেনকে চন্দ্রগুপ্তের সহিত বিবাহ দিয়া, পঞ্জাবপ্রদেশ যৌতুকস্বরূপ দান করেন, এবং মেগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীক্ দূত চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। ইহা, নিশ্চয় গ্রীক জাতির উদারতার পরিচায়ক। মেগাস্থিনিস্ মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ভারতীয় ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শাসন ও সমাজনীতি এবং কৃষি ও ও শিল্প বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহা পাঠে জানা যায় যে, তখন ভারতবাসিগণ সর্ব্ববিষয়ে সমধিক উন্নত ছিলেন। ভারতবাসিগণ সে সময়ে, ধর্ম্ম পরায়ণ, সরল, সাধু, সাহসী ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। যজ্ঞ ভিন্ন, অন্য কোন সময়ে মদ্যপান করিতেন না। রাজ্য অতি সুশৃঙ্খলারূপে শাসিত হইত। রাজ্যের সমুদায় বিষয় পর্য্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। রাজা ন্যায়পরায়ণ ও সর্ব্বদা প্রজার হিতসাধনে নিরত থাকিতেন। ইহা খৃঃ পূঃ ৩০৩ অব্দের বিবরণ।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন ও শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকালে হিউয়েন সং ভারতে আসেন তাঁহার বিবরণেও ভারতের পূর্ব্বোক্ত-রূপ অবস্থা বর্ণিত আছে।

ভারতে মুসলমান অধিকার—৯৭০ খৃষ্টাব্দে গজনীর অধিপতি সবুক্তগীন,

আছে। দিবা ও রাত্রির আবর্ত্তন আছে। আমরা যদি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া, উহা জড়, ও নিজে চৈতন্যশীল বলিয়া গৌরবান্বিত করি, তাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিরই পরিচায়ক। ক্ষুদ্র পিপীলিকা চলনশীল হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভাবিতে পারে যে, আমি কেমন ইচ্ছামত চলিতেছি, কিন্তু যাহার উপর উঠিয়াছি, তাহা চলিতে পারে না, এবং তাহা জড়পদার্থ। ইহা পিপীলিকার ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তিরই পরিচায়ক। আধুনিক কালে, জড়পদার্থ এবং গ্রহমাত্ররূপে বর্ণিত সূর্য্যদেব, যদি একদিনের জন্য অন্তর্ধান হন; তবে চৈতন্য-গর্ব্বিত মনুষ্য-সমাজের চৈতন্যশক্তির কি অবস্থা হয়, তাহা অনুভব করাও সেই গর্ব্বিত মানব সমষ্টির শক্তির বহির্ভূত।

জন্মান্তর-তত্ত্ব—পূর্ব্বোক্ত মায়োপহিত অহংকার, মন, বুদ্ধি ও চিত্তরূপী সূক্ষ্ম-শরীর—বা জীবাত্মা, মৃত্যুর দ্বারা স্থূল শরীরের পরিবর্ত্তন করিতে করিতে, ক্রমোন্নতি পথে চুরাশীলক্ষ যোনি অতিক্রম করিতেছেন।

লাহোরাধিপতি জয়পালকে পরাজিত করিয়া, সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমস্ত সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করিয়া ভারতে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত করেন। তদীয় পুত্র মহম্মদ দ্বাদশ বার ভারতের নানাস্থান আক্রমণ পূর্ব্বক, ধনরত্ন লুণ্ঠন ও দেব মন্দিরাদি ধ্বংস করিতে থাকেন, ক্রমে পঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করেন।

পাঠান অধিকার—১১৯১ খৃষ্টাব্দে, হীনচেতা জয়চন্দ্রের আহ্বানে, গজনীর তৎকালিক অধিপতি সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী, দিল্লীশ্বর পৃথিরাজকে আক্রমণ করেন, ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আক্রমণ করেন। জয়চন্দ্রের সহকারিতায় ও মহম্মদ ঘোরীর ছলনায়, রাত্রিকালে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত সৈন্যগণকে আকস্মিক আক্রমণ পূর্ব্বক, বিরুদ্ধ যুদ্ধনীতিতে পৃথীরাজকে বন্দী ও নিহত করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। পর বৎসর স্বদেশদ্রোহী জয়চাঁদকে পরাস্ত করিয়া কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও অযোধ্যা প্রদেশ জয় করেন। তদীয় সেনাপতি মহম্মদ-ই বখতিয়ার ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বিহার এবং ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ জয় করিয়া, ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে একাধিপত্য স্থাপিত করেন। এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষ পাঠানের অধিকৃত হইয়া পড়ে। পাঠান জাতির রাজত্ব কালে রাজশক্তির সহযোগে ও মুসলমান মোল্লাগণের প্ররোচনায়, অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মের এই অরাজকতার সময়ে কয়েকজন ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামানুজ, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামানন্দ ও কবির, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে

জীবের মৃত্যু হইলে, তদীয় পঞ্চভূতাত্মক স্থূলশরীর যেরূপ, বিরাট্ পঞ্চভূতে মিশাইতে চাক্ষুষ দেখা যায়; সূক্ষ্মশরীরও সেইরূপ সমষ্টিভূত বিরাট্ আত্মায় আশ্রয় পায়। পরে যাঁহারা অতৃপ্তকাম, তাঁহারা যথাসময়ে পুনরায় কামনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, তদনুরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট পিতা ও মাতার সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন পূর্ব্বক; তাঁহাদের স্থূলশরীর হইতে স্বীয় স্থূল শরীর গঠিত করিয়া, পুনশ্চ জন্ম পরিগ্রহ করেন ও স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন। প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিতে পারিলে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের খণ্ডন এবং উন্নতি বা অবনতিও করিতে থাকেন। কদাচিৎ কেহ পরিতৃপ্ত-কাম হইয়া মোক্ষ-সাধন পূর্ব্বক, জীবিতকালেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণে জীবের হিতসাধন করিতে থাকেন। ইঁহারাই জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া কথিত হন। আর যাহারা পরিতৃপ্তকাম ও মোক্ষ-লাভেচ্ছুক তাঁহারা জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া পরা-গতি

নানক, ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেব। ইঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইত, এবং অনেক মুসলমানও ইঁহাদের মতাবলম্বী হন।

মোগল অধিকার—অতঃপর ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঠান শাসনের অবনতি, এবং কতকগুলি হিন্দু ও পাঠান রাজ্য স্বাধীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর ভারত আক্রমণ করিয়া মোগলের প্রভুত্ব স্থাপন করেন ও ক্রমে পাঠান শক্তির অবসান হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগলগণ ভারতে রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে, কয়েকটি হিন্দু-রাজত্বের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

ইউরোপীয়গণের আগমন—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্যজাতি বাণিজ্য বিষয়ে সমধিক উন্নত ছিলেন, তাঁহারা দেশীয় জাহাজে চড়িয়া গ্রীস, মিশরাদি দেশে বাণিজ্য করিতেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে, আরববাসিগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, এবং গ্রীস ও মিশরের বাণিজ্য তাঁহারা হস্তগত করেন। ইহাঁরা, ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া বহুমূল্যে ইউরোপীয় বণিকদিগকে বিক্রয় করিতেন। এই বণিকদিগের মধ্যে ভিনিস এবং জেনোয়াবাসিগণই প্রধান। ইহারা আবার এই সকল পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহুমূল্যে বিক্রয় করিতেন। এই সময় হইতে ইউরোপের সকল জাতিই উক্ত বণিকদিগকে অধিক মূল্য দিতে অনিচ্ছুক হইয়া, বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে আসিবার

অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ লোকে গমন করিতে থাকেন; অর্থাৎ সেই বিরাট্ আত্মার সেইরূপ বিশিষ্ট স্থানে নীত হন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের প্রভাব-বিশেষে জীবাত্মার উর্দ্ধ বা অধোগতি হইয়া থাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে :—

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫
(চতুর্দ্দশ অধ্যায়)

—অর্থাৎ মৃত্যুকালে, যাহার যেরূপ স্বভাব ও কর্ম্ম-সংস্কার, তাহার তদ্রূপ ভাবই উদয় হয়। সুতরাং পুনরাবর্ত্তনকালেও সেই পূর্ব্ব সংস্কারসহ অনুরূপ স্থানে জন্ম হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে,

---

সমুদ্রপথ আবিষ্কারে কৃতসংকল্প হন। পর্ত্তুগীজগণের চেষ্টাই প্রথম এই উপলক্ষে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। পরে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কোডিগামা দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে আগমন পূর্ব্বক উত্তর-পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য স্থাপনা করেন। এইরূপে ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরাজাদি জাতিগণের ভারত আগমনের সূচনা হয়। ইংলণ্ডের এক বণিক্ সম্প্রদায় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাজকীয় শক্তির নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নাম ধারণ পূর্ব্বক ভারতে আসিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করেন। পরে ইহারা সুরাটে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিতে থাকেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজাহান ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেওয়ায় তাঁহারা পিপ্‌লী, হুগ্‌লী ও বালেশ্বরে, এক একটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন। পরে সম্রাটের কন্যা জাহানারাকে আরোগ্য করায় মান্দ্রাজে একটি দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি পান। তৎপরে আত্ম-রক্ষার্থ বর্ত্তমান কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম্ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভারত এই সময়ে নানা জাতির সংস্রবে ও তাঁহাদের পরস্পর অন্তর্বিদ্রোহে অতিশয় বিশৃঙ্খলপূর্ণ; অবসন্নপ্রায় ও অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন।

এই সময়ে ইউরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে ইংরাজ জাতিই ভগবৎ — প্রেরণায়, ভারতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ভারতের সেই মুমূর্ষ অবস্থায় পুনর্জীবনদায়ী অনেক উন্নতী বিধান করেন। তন্মধ্যে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার, সনাতন ধর্ম্মাদির

স্বর্গ-ভোগাদি হয়, রজোগুণের বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে, কর্ম্মাসক্তের গৃহে জন্ম হয়, ও তমোগুণের বর্দ্ধিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে, মূঢ়যোনি অর্থাৎ পশ্বাদি-যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। সুতরাং যতকাল পর্য্যন্ত না, কামনার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, ততকাল, কর্ম্ম-সংস্কার-প্রতিফলিত সূক্ষ্মশরীরকে স্থূলশরীর গ্রহণনান্তর বার বার, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা তৃষ্ণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা আর্য্যশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। আর্য্যগুরুগণ অধিকন্তু, সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরকে বিশ্লেষিত করিয়া যে চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইলেও সহজ বোধ করিবার জন্য পর পৃষ্ঠায় একত্রে লিপিবদ্ধ হইল :—

রক্ষণ ও পূর্ব্ব-প্রনষ্ট একচ্ছত্রী রাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠান এই কয়টিই প্রধান। ইংরাজ জাতি প্রকৃতই বহু সদ্‌গুণ আয়ত্ত করিয়া, বিধাতার স্থায়-সঙ্গত বিধানে, জগতে অতুল আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন।

তত্ত্ব	গুণ	জ্ঞান ও জ্ঞানেন্দ্রিয়	কর্ম্ম ও কর্ম্মেন্দ্রিয়	মানব দেহ	দৈহিক স্থান	অন্তর্জগৎ বা চক্র	বাহ্যজগৎ
পরম ব্রহ্ম	নির্গুণ	নির্ব্বাণ	অস্তি জ্ঞান	কারণ শরীর	মস্তক	সহস্রার	সত্যলোক
সগুণ ব্রহ্ম ও মহত্তত্ত্ব বিরাট ও সরাট অহংকার	মন	বুদ্ধি	চিত্ত	সূক্ষ্ম শরীর চারিতত্ত্ব	ভ্রূমধ্য	আজ্ঞা	তপোলোক
ব্যোম	শব্দ	কর্ণ	বাক		কণ্ঠ	বিশুদ্ধ	জনলোক
মরুৎ	ও স্পর্শ	ত্বক্	পাণি		হৃদয়	অনাহত	মহর্লোক
তেজ	ও রূপ	চক্ষু	পাদ	স্থূল শরীর বিশংতিতত্ত্ব	নাভি	মণিপুর	স্বর্লোক
অপ্	ও রস	জিহ্বা	উপস্থ		লিঙ্গমূল	স্বাধিষ্ঠান	ভুবর্লোক
ক্ষিতি	ও গন্ধ	নাসিকা	পায়ু	সমষ্টি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব	গুহ্যদেশ	মূলাধার	ভূর্লোক

সাধন মার্গ—প্রদর্শিত পঞ্চভূত ও তজ্জাত পঞ্চ তন্মাত্র বা গুণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই বিংশ তত্ত্বের দ্বারা স্থূল শরীর গঠিত হয় এবং অবিনাশী বিরাট্ আত্মার, অংশরূপী, সরাট্ অহংকার, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই চারিটির সমষ্টিই সূক্ষ্ম-শরীর। কামনারূপিনী অবিদ্যা মায়ার দ্বারা, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের সমন্বয় সাধিত হইয়া মানব দেহ, তথা জীবদেহ গঠিত হয়। কামনাত্যাগ বা মোক্ষলাভেই সূক্ষ্ম শরীরের, স্থূলশরীর-গ্রহণ নিবারিত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ভোগে, পরিতৃপ্ত হইতে না পারিলে, কামনাত্যাগ বা মোক্ষলাভ করা অসম্ভব। কিন্তু এই কামনাত্যাগও সাধন-সাপেক্ষ।

মোক্ষে লক্ষ্য থাকিলে, এবং উহা লাভের জন্য সাধন মার্গ অবলম্বন করিলে, তবে ভোগে পরিতৃপ্তি আসে; নচেৎ মোক্ষে লক্ষ্যহীন ব্যক্তি-গণের ভোগে পরিতৃপ্তি আশা দূরে থাক্, তাঁহারা দিন দিন ভোগের দাস হইয়া পড়েন। প্রমাণ স্বরূপ আধুনিক কালে, এইরূপ লোকের অভাব নাই। আত্মজ্ঞানহীন ইহ-সর্ব্বস্ব-জ্ঞানবিশিষ্ট এই বিলাস-ভোগের যুগে, কেহ কেহ মোক্ষ-সাধনকে কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিবার সাহসও করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আত্মার অস্তিত্ব, ও অবিনশ্বরত্ব উপেক্ষা পূর্ব্বক, বিলাস পঙ্কে নিমজ্জিত হইবার সুবিধা করিয়া লয়েন। কিন্তু তাঁহারা যদি কিয়ৎকালের জন্য, ঐহিকবাসনা-বিমুক্ত হইয়া, চিত্তের স্থৈর্য্য-সাধন পূর্ব্বক, স্বীয় মনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবেন যে, মৃত্যুর পর কামনা-বিদগ্ধ আত্মার অস্তিত্ব থাকে।

নিদ্রিতাবস্থায়, জীবগণের স্থূলদেহ নিষ্ক্রিয়, এবং সূক্ষ্ম দেহান্তর্গত মন, বুদ্ধি ও চিত্ত, অহংকারে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া, অবশিষ্ট একমাত্র চৈতন্য-স্বরূপ সরাট্ অহংকার বা জীবাত্মা, তদীয় স্থূল দেহের সহিত প্রাণের

ক্রিয়া বর্ত্তমান রাখিয়া, যেমন নিদ্রাসুখ অনুভব করেন, এবং যখন কারণ বশে আবার, মন ও আত্মার সহিত সক্রিয় হইয়া পড়েন, তখন স্বপ্নাদি দর্শন অথবা নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেইরূপ মহানিদ্রা, মৃত্যু, বা স্থূলদেহ ত্যাগ হইলেও, জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্ম-প্রতিফলিত-সংস্কার-জনিত সুখ ও দুঃখাদি ভোগ করিতে থাকেন। যখন নৈসগিক কারণ বশে, সেই সেই আত্মাতে, পুনশ্চ মনের উদয় হয়, তখন অতৃপ্ত কামনা তাড়িত হইয়া, বুদ্ধি ও চিত্ত সহ প্রথমে, সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করেন। পরে তদনুরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব বা পিতা মাতার সূক্ষ্মশরীর অবলম্বন পূর্ব্বক, তদীয় স্থূল শরীর হইতে স্বীয় স্থূলদেহ গঠন করিয়া, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিদধিক চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীয় মনই, এ বিষয়ের সমস্ত মীমাংসা করিয়া দেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদের এ চিন্তা করিবার সামর্থ বা অবসর নাই, তাঁহারা পাশব যোনি হইতে, অত্যল্পকালই মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের উক্ত চিন্তানুরূপ মনঃ-সংযম করিতে বিলম্ব আছে, সুতরাং তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। মানুষ, পশু, পক্ষি, কীট পতঙ্গাদি, সকল শ্রেণীর জীবাত্মাই এইরূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতেছে, এবং কেহ শিক্ষকতা না করিলেও, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সংস্কার-গত, প্রকৃতি ভাগ্য ও লাভ করিতেছে। সুতরাং জীবাত্মা-রূপী, অবিনশ্বর আত্মার, বার বার এইরূপ জন্ম-মৃত্যু-ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি যন্ত্রণার প্রশমনার্থে, ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তি ও মোক্ষ সাধন পূর্ব্বক, চতুর্বর্গ লাভ করাই যে বাঞ্ছনীয় এবং পরম পুরুষার্থ, তাহা বলাই বাহুল্য। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, আত্মার অবিনশ্বরত্ব যাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই চতুর্বর্গ সাধনই সার্ব্বজনীন পন্থা এবং তন্মধ্যে মোক্ষই যে সার্ব্বজনীন

চরম লক্ষ্য, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা সংক্ষেপে বিচারিত হইল।

আর্য্যগুরুগণ অধ্যাত্ম-জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই, সগুণব্রহ্ম ও মহাপ্রকৃতির রূপ। ইহার অস্তিত্ব ও বস্তুত্বই ব্রহ্ম, এবং রূপ, গুণ ও ক্রিয়া শক্তিই প্রকৃতি। ইঁহারাই বেদান্তের ব্রহ্ম এবং মায়া, সাংখ্যের পুরুষ এবং প্রকৃতি শাক্তের শিব ও শক্তি, বৈষ্ণবের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী। ইঁহারাই মহত্তত্ত্বলোকে লীলা নিরত হইয়া, তদঙ্গজ, সত্ব, রজ ও তমোগুণ দ্বারা, তদীয় বিরাট্ আত্মা বা অহংকার হইতে, পঞ্চভূতাদিক্রমে, অপরা প্রকৃতি-উপহিত বিশ্ব-রচনা করিয়া পরাপ্রকৃতির লীলাস্থল জীব-জগতে বহুমুখীন হইয়া, চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর, যে মানব জাতিরূপে পরিণত হইলেন; তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর, এবং বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট এক একটি, শিব-শক্তিরূপী সরাট্-অহংকার, বা জীবাত্মা, অথবা পুরুষকার। স্বাধীন, স্বতন্ত্র, ও সরাট্-অহংকার রূপে, যেন নিজ নিজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহের, এক একটি ঈশ্বর রূপে প্রতীয়মান হইয়া, এক ব্রহ্ম বহু হইলেন। সরাট্ জীবাত্মাগণ এইরূপে লীলারত হইয়া ক্রমশঃ, এই জ্ঞান লাভ করিলেন যে, এই সরাটের পুনশ্চ বিরাটত্ব-সাধনই, তাঁহাদের চরম লীলা ও পরিণতি। অর্থাৎ মহামায়ার অংশজা অবিদ্যা ও বিদ্যা মায়ায় প্ররোচনায়, তাঁহারা বর্ত্তমানে যে অবস্থায় উপনীত, চতুর্বর্গান্তর্গত ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পরিণতি ও পরিতৃপ্তিতেই সেই জৈবিক গতির পরিণতি, এবং সে গতির পুনরধোগতির বিরতি, একমাত্র মোক্ষে।

গুরুকরণ—এই চতুর্বর্গ ফল কিরূপে লাভ হইবে এবং ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা কি? আর্য্যশাস্ত্র ইহার উত্তরে বলিয়াছেন :—

"মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"

এই মহাজন কাহারা? যাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেন বা এই ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী তাঁহারাই ইহার মহাজন। তাঁহারা যে পথে গিয়াছেন অথবা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথই প্রকৃত পথ। তাঁহারা কাহারা? তাঁহারাই গুরু। পিতা, মাতা, শিক্ষাদাতা, ও দীক্ষাদাতা। ইঁহারাই মহাজন। ইঁহারাই মানুষকে এজগত দর্শন করাইয়া থাকেন। ইহারাই, সাধককে আত্ম-সাক্ষাৎকারী জ্ঞান প্রদান করিয়া, তাঁহাদের সরাট-অহংকারকে বিরাট অহংকারের সহিত, বা জীবাত্মাকে, পরমাত্মার সহিত, অথবা পুরুষকারকে দৈবের সহিত সংযোগ সাধনপূর্ব্বক, চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। (চিত্রে দ্রষ্টব্য) দেহরূপ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক, এই ক্ষুদ্র মানুষকে অনন্ত জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী করিয়া, ক্রমশঃ ভগবৎ পদে অধিষ্ঠিত হইবার পন্থা ইঁহারাই শিক্ষা দেন। বিশ্বাস ও ভক্তিগুণের উদ্রেক করিয়া, ইঁহারাই জীবকে শিব করিয়া দেন। কেবলমাত্র উপযুক্ত সাধকগণ সাধারণে অপ্রকাশ্য, এই জ্ঞান গুরু-কৃপাবলেই লাভ করেন। গুরু প্রদর্শিত পন্থানুসরণে বিরাটের সহিত সরাটের এই যে সংযোগ সাধন, ইহারই নাম যোগ-সাধনা। তন্ত্রাদি আগম শাস্ত্রসমূহ, এই ব্রহ্মাভিগমনের পন্থা উদ্ভাবিত করিয়া, এ বিষয়ের চরম শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

গুরু কৃপায় শিক্ষা দীক্ষাদি লাভ করিয়া, সাধনমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক, সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীর হইতে বিশ্লেষিত করিয়া, বিরাটে বা ব্রহ্মে, সংযোগ সাধনই, যোগ-সাধন। এ বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এস্থলে অসম্ভব, পরন্তু যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র সমূহে দ্রষ্টব্য, এবং গুরুকৃপালভ্য। তবে সেই বিজ্ঞান-সম্মত প্রক্রিয়াগুলি এস্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে মাত্র।

যোগতত্ত্ব—প্রথমে পূর্ব্বজন্মের পাশব-বৃত্তি-সূচক, আহার, নিদ্রা,

ভয় ও মৈথুনাদি বৃত্তিচতুষ্টয়কে পরিমিত করিতে হয়। ইহাকেই মিতাচরণ বলে। মিতাচারই মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম সোপান। সনাতন ধর্ম্মে ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। ইহাতে শরীর রোগশূন্য, কর্ম্মক্ষম, ও মন চিন্তাশীল হইয়া বিবেক-জ্ঞানের উদয় হয়। পরে বিবেক-বিচার, সৎশিক্ষা, ও সৎবিদ্যানুশীলন দ্বারা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, ও মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুর দমন করিতে পারিলে মানুষ প্রকৃত মনুষ্য নামে গণ্য হন। তৎপরে, বহুকাল-প্রচলিত ও সুপরীক্ষিত কতকগুলি কৌশলের দ্বারা সূক্ষ্ম-শরীরকে স্থূলশরীর হইতে বিশ্লেষিত করিতে পারিলে, জৈবিক-স্বাধীনতা ও সাত্বিকভাব লাভ হয়; এই কৌশলই যোগাভ্যাস। যোগের অঙ্গ অষ্ট প্রকার! এ সম্বন্ধে, মহর্ষি পাতঞ্জলির যোগসূত্র হইতে, কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত ও প্রদর্শিত হইল। ইহা ষড়দর্শনের অন্তর্গত একখানি দর্শনশাস্ত্র।

যম, নিয়মাসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার।
ধারণা ধ্যানসমাধয়োষ্টাবঙ্গানি ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই আটটি অঙ্গ।

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম।

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ

শৌচ (বাহ্যশুদ্ধি) সন্তোষ (অন্তঃশুদ্ধি) তপঃ (গুরোপদিষ্ট ক্রিয়া) স্বাধ্যায় (দেহমধ্যে ওঁকার ধ্বনিশ্রবণ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান, (পরম গুরু ঈশ্বরে মন সংযোগ) এই পাঁচটি নিয়ম।

তত্রস্থির সুখাসনম্

যে আসনে মন স্থির হয় ও সুখানুভব হয়, তাহাই অবলম্বনীয় (গুরোপদেশসাপেক্ষ)

এইরূপে আসন-সিদ্ধি হইলে দ্বন্দ্ব-ভাবের অনভিঘাত হয়, অর্থাৎ শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসাদির অনুভব হয় না।

তস্মিন সতিশ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

তৎপরে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ারগতি-বিচ্ছেদরূপ কৌশল অভ্যাস করাই, প্রাণায়াম। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে, প্রাণায়ামই অতি শ্রেষ্ঠ। প্রাণায়াম ক্রিয়ার সামর্থ লাভ করিবার জন্যই, যম, নিয়মাসনাদি অঙ্গের সাধনা করিবার আবশ্যক হয়। দ্বিজাতির উপনয়ন-সংস্কারের সময় হইতেই সহজভাবে, এই প্রাণায়াম অভ্যাস করিবার বিধান আছে। প্রাণায়ামের ফল, প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। এইগুলি যোগ বিভূতির অন্তর্গত।

স্ববিষয়াসম্প্রযোগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার৽ইবেন্দ্রিয়াণাম্প্রত্যাহারঃ

প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে সম্প্রয়োগাভাব অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধাদিতে প্রয়োগের অভাব হইয়া অগত্যা চিত্ত স্বরূপমাত্র অনুকারী হইয়া যায়; ইহারই নাম প্রত্যাহার।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা

পূর্ব্বোক্ত স্বরূপমাত্রে অধিষ্ঠিত চিত্তের; নাভিচক্রে, হৃদয়ে, কুটস্থে, নাসাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, বা কোন এক প্রতিমা, শিলাদি বাহ্য বিষয়ে, একাগ্রতা স্থাপনই ধারণা।

তত্রপ্রত্যেয়ৈকতানতাধ্যানম্

উক্ত প্রকারের বর্দ্ধিত ধারণা-শক্তির দ্বারা, উল্লিখিত স্থান বিশেষে, (যথায় চিত্তের ধারণা সাধিত হইয়াছে, তথায়,) প্রত্যয়ের একতানতা, অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিতির নাম ধ্যান।

তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ

ধ্যাতা (মন) ধ্যেয় (ব্রহ্ম) ও ধ্যান (উক্ত ক্রিয়া) একই বোধ হইয়া স্বরূপ শূন্যের ন্যায় একমাত্র ব্রহ্মভাবই সমাধি।

ত্রয়োমেকত্র সংযমঃ।

ধ্যান, ধারণা ও সমাধি একত্রিভূত করিয়া কোন এক বিষয়ে আরোপ করার নাম সংযম।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ

এই সংযম জয় করিলে প্রজ্ঞার আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যে বিষয়ে সংযম করা যায়, সে বিষয়ের সমূহ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে, এযাবৎ যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে, সে সমস্তই এই প্রজ্ঞালোক-সম্ভূত। যে কোন ধর্ম্মাশ্রয়েই হউক, এই প্রজ্ঞালোকই মনীষিবর্গের সার সম্পত্তি। ধর্ম্মবিশেষে যদিও যোগ-সাধন প্রক্রিয়ার প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তত্রাচ মনের একাগ্রতা-সাধন করিবার পন্থা, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে ; এবং তদনুরূপ প্রজ্ঞালোকও, সেই সমস্ত মনীষিগণ লাভ করিয়া নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন।

পাতঞ্জলাদি যোগ-শাস্ত্রে, এই সংযম প্রয়োগ দ্বারা, নানারূপ অলৌকিক শক্তি, অষ্টৈশ্বর্য্য, এবং বহুল প্রাকৃতিক-তত্ত্ব জ্ঞান লাভের পন্থা উল্লিখিত আছে ; কিন্তু সে সমস্তই গুরোপদেশ সাপেক্ষ, সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। ভারতে যোগ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অভাব নাই, ইহা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। কালপ্রভাবে তাদৃশ গুরুর সর্ব্বত্রে প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও, একেবারে অভাব নাই। দ্বিজাতিগণের শৈশবকালে উপনয়ন-সংস্কারের সময়, যে প্রণায়ামাদি ক্রিয়ার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, বয়ঃকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা এতাবৎ তাঁহার অনুশীলন করিয়া

আসিয়াছেন, তাঁহারা যোগ-বিজ্ঞান' রাজ্যে অনেক অগ্রসর হইয়াই আছেন। শাস্ত্র ও গুরু-সাহায্যে, তাঁহাদের অধিকতর অগ্রসর হওয়া কঠিন নহে। এ জগতে অভাব কিছুরই নাই, কেবল অভাব ক্রিয়া-শক্তির ও অভাব প্রকৃত মানুষের। বহুকালব্যাপী অনুশীলনের ফলে, যোগ-বিজ্ঞান, ব্রহ্মদেশের একমাত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ক্রীড়া, কৌতুক ও ব্যসনোন্মত্ত যুবকদিগের ক্ষণিক অনুষ্ঠানে যোগ-বিজ্ঞান আয়ত্তিভূত হইবার নহে।

যোগ-বিজ্ঞানের অচিন্ত্য প্রভাব অনুধাবন করিলে. এই বিংশ শতাব্দির বিলাস ব্যসনও তুচ্ছ বলিয়া, অনুমিত হইতে পারে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে, হরিদাস যোগীর যোগ-শক্তির অলৌকিক প্রভাব দর্শনে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ম্যাক্‌নাটন্, ডাক্তার মরে ও জেনারল ভেঙ্কুরা প্রমুখ, প্রায় ছয় শত ইউরোপবাসী বিস্মিত হইয়াছিলেন। হিমালয়বাসী মহাত্মাগণের যোগ-বিজ্ঞান দর্শনে. আধুনিক থিয়সফিষ্ট সোসাইটীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত যুবকগণের বি, এ, পাশ করিতে যে সময় ও একাগ্রতার আবশ্যক হয়, যোগের সার প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে, ততদূর আবশ্যক হয় না। অধিকন্তু ইহা দীন দরিদ্রেরও সুলভ। কষ্টকর প্রাণায়াম অবিধেয়—

বালবুদ্ধিভিরঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্রমবরুধ্য
যঃ প্রাণায়াম ক্রিয়তে স খ খলু শিষ্টৈঃ ত্যজ্যঃ

(ঋগ্বেদ ভাষ্য)

বালকবুদ্ধি-বিশিষ্ট অর্থাৎ শিক্ষানুবীশদিগকেই অঙ্গুলীদ্বয়এবং অঙ্গুষ্ট দ্বারা, নাসিকা ছিদ্র বন্ধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা শিষ্ট বা সাধকদিগের ত্যজ্য।

রেচকং পুরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ু ধারণম্ ।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্ত স কেবল ইতি স্মৃতঃ ॥

শিক্ষানবীশদিগকে প্রথমে, অবশ্য অঙ্গুল্যাদির দ্বারা নাসিকাচ্ছিদ্র অবরোধ পূর্ব্বক প্রাণায়াম আভাস করিতে হয়, কিন্তু অভ্যস্ত হইলে রেচক পূরক ও কুম্ভক না করিয়া, সুখের সহিত যে বায়ু ধারণ সেই প্রাণায়ামই কেবল প্রানায়াম। ইহাই "কৈবল্য"। এ সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান গুরুকৃপালভ্য। আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে, যথাসময়ে সদগুরু লাভ হয়, ইহাই সাধুগণের অভিমত। কর্ণেল অলকট্ ও ম্যাডাম ব্লাভাডাস্কি একমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টার বলে, যখন ভারতীয় গুরু লাভ করিয়াছেন, তখন ভারতীয় নরনারীর গুরুলাভের চিন্তা কি ?

যোগ-সাধনার জন্য সাধারণ মানবের বনে বা পর্ব্বতগুহায় যাইবার আবশ্যক হয় না। গৃহস্থ আশ্রমে স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া, গুরোপদেশ মতে, সময়ের কিঞ্চিৎ সুব্যবহার করিলেই, যথেষ্ট হইবে। এতদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গই লাভ হইবে। প্রকৃতপক্ষে যোগের সার প্রাণায়াম ক্রিয়া, অতি স্বাভাবিক কেবল স্বীয় শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর লক্ষ রাখিলে, প্রণায়াম স্বতঃইসাধিত হয়। নিশ্বাস শ্বাসরূপেন মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে (শিব উক্তি)

"দেহে আমি" বোধ ত্যাগ করিয়া, "শ্বাসে আমি" বোধ করিতে পারিলে, ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মদর্শন লাভ হয়। প্রকৃত পক্ষে "শ্বাসই আমি" শ্বাস আছে তাই "দেহ আমি" আছে এই শ্বাস যখন না থাকে তখন কোথায় "দেহ" আর কোথায় "আমি"। শ্বাসের দ্বারাই, দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে। শ্বাস স্থির হইলে, মন স্থির হয় এবং মন স্থির হইলেই উহা আত্মায় পরিণত হইয়া যায়; ইহাই "আত্মসাক্ষাৎকার"।

গুরোপদেশ মতে, বিশিষ্ট শ্বাস ক্রিয়া, অর্থাৎ প্রণায়াম সহযোগে, শ্বাস বায়ু-মণ্ডলি, বা ষটচক্রের অবস্থানগুলি জ্ঞাত হইয়া, উহাদিগকে ভেদ, বা কুণ্ডলিনী শক্তিকে লইয়া, ঐ সকল স্থানে আরোহণ এবং অবরোহন করাই যোগক্রিয়া। এই ক্রিয়া সাধন দ্বারা মানুষ, নির্ব্বাধি-দেহ, অনন্ত জ্ঞান, এবং সমস্ত অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইতে পারেন। শিব-সদৃশ, পরম পূজনীয় মদীয় পিতাঠাকুর মহাশয়, তাঁহার ভাবী মৃত্যুর দিন-নিদ্ধারণপূর্ব্বক, ৺কাশীধামে দেহ রক্ষা করিবার মানসে, আমাদিগকে সমস্ত বিবৃত করিয়া, এবং বিদায় লইয়া কাশীযাত্রা করেন, এবং নির্দ্ধারিত দিবসের মধ্যে দেহরক্ষা করেন, তাহা আমরা এবং আমাদের গ্রামস্থ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহা মাত্র দশ বৎসরের কথা।

ধর্ম্ম—যোগসাধন দ্বারা স্থূলশরীরের ক্রিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম-শরীর বা মন, নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় স্থিরতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ক্রিয়া সমধিক বিকশিত হয়। এই সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়াই চিন্তা বা ধ্যান। সাধক তখন ধ্যানযোগে, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক জগতের সমস্ত রহস্য জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়া, নির্ণীত সত্য-পথ বা চতুর্বর্গ লাভে অগ্রসর হন। এই সময়ে সাধক গুরুকৃপায়, সাধক ও গুরু, সরাট ও বিরাট অহংকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জীব ও ঈশ্বর, পুরুষকার ও দৈব ইত্যাদি দ্বৈতভাবের সমন্বয় অনুভবপূর্ব্বক, তত্ত্বমসি ভাবের উদয়ে, লক্ষ্যীভূত চতুর্বর্গের প্রথম ফল, ধর্ম্ম লাভ করেন। চুরাশী লক্ষ যোনি অতিক্রমণকালে যে সকল জৈব-ধর্ম্ম আশ্রয় হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার পরিণতি প্রাপ্ত হইল। এই ধর্ম্মই মানবের' লৌকিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িকাদি ধর্ম্মের চরম পরিণতি।

ধর্ম্ম শব্দে গুণ বুঝায়। চরাচর বিশ্বে, যে পদার্থ যেরূপ গুণান্বিত

তাহাই, তাহার ধর্ম্ম। পঞ্চ তন্মাত্রই পঞ্চভূতের ধর্ম্ম। মৃত্তিকা-স্থিত বীজ হইতে উদ্ভূত হইয়া, যথাকালে, স্বীয় গুণান্বিত ফল, ফুলাদির উৎপাদনই, সাধারণ উদ্ভিজ্জ জীবের ধর্ম্ম। আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুনাদি বৃত্তিচতুষ্টয়ের অধীন হইয়া, চলচ্ছক্তিমান এবং ক্রিয়াশীল হওয়াই, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ জীবের, জৈব-ধর্ম্ম। এতদতিরিক্ত জ্ঞানলাভপূর্ব্বক, চরম পরিণতিপ্রাপ্ত জীব—কেবলমাত্র মনুষ্যজাতিই লৌকিক, সামাজিক, বা সাম্প্রদায়িকাদি ধর্ম্মাবলম্বনে, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ আশ্রম হইতে সাধনা আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্ম বিদ্যালাভপূর্ব্বক, কালে এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারেন; পাশবজাতি হইতে মনুষ্যজাতির ইহাই বিশেষত্ব। ব্রহ্মজ্ঞান মূলক এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মলাভ হইলে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ট, বা বৌদ্ধাদি ধর্ম্মে আর কোন ভেদাভেদ অনুভূত হয় না। এবং কীট পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট জীবেও, আত্মানুভূতি হয়।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, একাদিক্রমে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্ট ও বৌদ্ধাদি, সকল ধর্ম্মের সাধন ও সমন্বয় করিয়া, এই আদি, সনাতন, ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মেরই, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ভোগের রাজ্যে, স্বার্থ-সাধন উদ্দেশ্যে, যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞান বহির্ভূত গোঁড়ামি অবলম্বন করিয়া, স্বীয় ধর্ম্ম কলঙ্কিত করেন, এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, তাঁহাদের পক্ষে স্বার্থহানিকর হইলেও, যাঁহারা ত্যাগের রাজ্যে মোক্ষফল লাভাকাঙ্ক্ষী, অর্থাৎ প্রকৃতই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভে অগ্রসর—যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে, তাঁহাদের কোন মতভেদ নাই। সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত, ও বৈষ্ণব এই পঞ্চমত ও এইখানেই একত্ব পাইয়াছে। এই খানেই, জীবেদয়া ও নামে রুচি এই দুই মহাসত্য-ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া, মানবজীবনের সর্ব্ববাদী-সম্মত-সার্থকতা-সাধন-রূপ কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই স্থানে যেমন ধর্ম্মের পরিণতি হইয়াছে, সেইরূপ

জৈবিক কর্ম্মও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যানিত্য-বিবেকবিচারিত-স্থিরীকৃত লক্ষ্যানুযায়ী কর্ম্মও, এই স্থান হইতে আরব্ধ হইয়াছে। সেই কর্ম্মই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে "জীবে প্রেম ও নামে রুচি বা ভগবদ্ভক্তি।"

এই সর্ব্বজনীন ধর্ম্মলাভই, প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যত্ব লাভের চরম পরিণতি বা শিবত্ব পদলাভ। শিবরূপী সগুণ ব্রহ্মে, জীব এইস্থানেই সংযোজিত হন। জগতের সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীরও, এইস্থানে ভগবৎ পদ লাভ হয়। মহাত্মা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেন এই ধর্ম্মভাব অনুভব করিয়াই, মনুষ্যজাতিকে এইখানে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদাদি, ভগবান প্রমুখ-অবতারগণও এই ধর্ম্মভাবই, মনুষ্য-জাতিকে—দেশ, কাল ও পাত্রানুরূপ ন্যূনাধিকভাবে, বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি, বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, এই ধর্ম্মভাবই নানা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালমহাত্ম্যে, ইদানিন্তন কালে, আবশ্যকতা উপলব্ধি হওয়ায়, হিমালয়বাসী মহাত্মার নিকটে জ্ঞানলাভান্তে, মহাত্মা কর্ণেল অলকট ও ম্যাডাম ব্লাভাডাস্কি যে থিওসফি বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি। বিদুষী আনি-বেসাণ্ট যে ভবিষ্যান্ন ভোজিনী ব্রহ্মচারিণী হইয়াছেন তাহাও ইহারই গুণে। এই সমস্তই সগুণ ব্রহ্মরূপ মহাকালেরই, লীলা। এই নৈসর্গিক কারণ বশতই আজ, এই নগণ্য লোকের লেখনীও, এই মহত্তত্ত্ব উদ্গীরণ করিতেছে।

অর্থ—ব্রহ্মজ্ঞান মূলক এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-সাধনায় সিদ্ধ হইলে পর, চতুর্বর্গের দ্বিতীয় ফল অর্থলাভ হয়। এই অর্থ ঐহিক অর্থের পরিণতি বা পরমার্থ। যে অর্থ প্রলব্ধ হইলে, তাঁহার পদাম্বুজে, ঐহিক অর্থশালী রাজরাজ্যেশ্বরগণের মস্তকও ভক্তিভরে নত হয়, ইহা সেই অর্থ। যে অর্থ লাভ করিয়া ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বেদব্যাস, নারদাদি

মহর্ষিগণ, তৎকালের রাজরাজ্যেশ্বরগণকে, অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত করিতেন, ইহা সেই অর্থ। যে অর্থের প্রভাবে, প্রতীচ্যের মনীষি সেক্সপিয়র, ম্যাক্সমুলার, গ্লাডষ্টোনাদি মহাত্মাগণ, মানব সাধারণের নিকট হইতে সম্মানলাভে, তদানিন্তন সম্রাট সম্রাজ্ঞিগণকেও পরাভব করিয়াছিলেন, ইহা সেই অর্থ। যে অর্থলাভ করিতে পারিলে, ঐহিক রাজৈশ্বর্য্য সমূহ ধূলি-মুষ্টিবৎ তুচ্ছবোধ হয়, ইহা সেই অর্থ। যে অর্থ লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বহুঅর্থশালীর বিপুল অর্থদান প্রত্যাখান করিয়া, "টাকা মাটি মাটি টাকা" বলিয়া গঙ্গাজলে অর্থ নিক্ষেপ করিতেন, ইহা সেই অর্থ। যে অর্থ লাভ হইলে, অষ্টসিদ্ধি করায়ত্ত করিয়া মানব, এই নশ্বর জীবনে ভগবান আখ্যা প্রাপ্ত হন; ইহা সেই অর্থ। যে অর্থ প্রলব্ধ হইলে, ঐহিক ধন-সম্পদাদি ও পারলৌকিক জ্ঞান রত্নাদি এই উভয়েরই, কোন অভাব অনুভূত হয় না, ইহা সেই অর্থ।

কাম—ধর্ম্ম ও অর্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলে, তৃতীয় ফল কাম লাভ হয়। জৈবিক কামনার পরিণতি ও পরিতৃপ্তিই এই কাম। জীব এই কামনা-শক্তিবিহীন হইলেই, শবত্ব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সাময়িক বিহীনতায় মৃত্যু এবং সম্পূর্ণ বিহীনতায় মোক্ষ প্রাপ্ত হন। জীবাত্মার জীবন ধারণের মূল ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাস, বাহুকালগত আত্মীক সংস্কার ও অভ্যাস বসে, স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হইলেও, জীবনধারণাকাঙ্ক্ষিনী কামনা শক্তিই যে, সেই ক্রিয়ার মূল কারণ, তাহা সাধকগণের অবিদিত নাই। ইচ্ছাশক্তি স্বরূপিনী, জগজ্জননী, মহামায়ার, অংশজা বিস্তামায়াই ইনি। এই কামনাশক্তিই জীবজগতের অস্তিত্বের অবলম্বন। এই কামনা শক্তিই মোক্ষানন্দ ভোগ লক্ষ্য করিয়া, জীবজগতে বহুরূপ ধারণপূর্ব্বক, চরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ পথে, মাতৃ ও স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া,

চিরসঙ্গিনী হইয়া, জীবাত্মার রক্ষা ও আনন্দ বিধান করিয়াছেন। জীবাত্মাই শিব, এবং এই কামনাই, শক্তিস্বরূপিনী। এই কামনাশক্তির প্ররোচনা ও তৃপ্তি হেতু, জীবাত্মা কতই প্রকার সুখ, দুঃখ ও আনন্দ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে ধর্ম্মার্থ-সিদ্ধ সাধককে, তত্ত্বমসি-জ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক, এই শুদ্ধা-কামনারূপিনী বিদ্যামায়া অন্তর্হিতা হন এবং মূলীভূতা ইচ্ছাশক্তিরূপিনী মহামায়ারূপে, সাধককে দর্শন দেন। জগজ্জননী মহামায়াকে দর্শন করা ব্যতীত, এই কামনা পরিতৃপ্তির আর অন্য উপায় নাই। তাই এখানে, অবিদ্যা ও বিদ্যা মায়ারূপের সংবরণ পূর্ব্বক, সাধকের নিকট স্বীয় মহামায়ারূপের প্রকাশ করিয়া থাকেন।

মোক্ষ বা সামিপ্য মুক্তি—সেরূপ দর্শনে, সাধকের সমস্ত ঐহিক কামনার পরিতৃপ্তি হওয়ায়, অচিরেই সাধককে সর্ব্ব-জীবলোকাঙ্ক্ষিত, মোক্ষফল শোভিত, পদ যুগলে আশ্রয় দেন। মোক্ষফল লাভ হইলে, সাধকের ইহলোকে পুনরাবির্ত্তন নিবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল-লব্ধ সাধক, তখন সেই চৈতন্যময়ীর চরণ যুগল অবলম্বন পূর্ব্বক, জগজ্জননীর অনন্তরূপ ও অনন্তলীলার দ্রষ্টা স্বরূপে মাত্র অবস্থান করিয়া, মোক্ষানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। ভগবান্ পাতঞ্জলী এই অবস্থার বর্ণনায় বলিয়াছেন:—"তদা দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থানম্"। অধিকাংশ সাধকই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পূর্ব্বোক্ত রূপ পূর্ণ পরিণতি সাধন করিতে অক্ষম হইয়া, কেবল ভক্তিযোগে ইষ্ট দর্শন করিয়া কামনার পরিতৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক, মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। কলিযুগে সল্পায়ু মানবের পক্ষে ইহাই, প্রশস্ত পথ। এই পথেও ধর্ম্মার্থ-কামের পূর্ব্বোক্ত যোগ-বিভূতি সমূহ, আয়ত্ত না হইলেও সমূহ জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী।

ব্রহ্মময়ীর অনন্তরূপ, শক্তি ও মহিমাপূর্ণ লীলা দর্শনে, সাধক তখন

ক্ষণিক সমাধি অনুভব করেন। এই জ্ঞান অতি গুহ্য ও গুরুকৃপা লভ্য। সাধকের এক্ষণে মাতৃদর্শনে সগুণ ব্রহ্মলোকের চতুর্বর্গ সাধন সমাপ্ত হওয়ায়; নির্গুণ ব্রহ্মপদাভিলাষিনী শুদ্ধা-ইচ্ছা মাত্রই বর্ত্তমান থাকে, এবং সমাধি অবস্থা, ক্রমিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই নির্গুণা শুদ্ধা-ইচ্ছা প্রবৃত্তি মূলক না হইয়া নিবৃত্তি মূলক হওয়ায়, ইহার দ্বারা কোন কর্ম্ম ফল সৃষ্ট না হইয়া, পূর্ব্ব সঞ্চিত সদসৎ কর্ম্মফল সমূহের ক্ষয় হইয়া, মাতৃদর্শনের ফল প্রদান করে।

এতদিনে সাধকের সূক্ষ্ম শরীরের পূর্ণ পরিণতি হওয়ায়, স্থূল দেহের মমতা হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া, তখন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাই প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এ সময়ে ইচ্ছামত স্থূল দেহে, কখন বা সূক্ষ্মদেহে, কখন বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সমাধির দ্বারা স্থূলদেহকে লিঙ্গবৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সূক্ষ্মদেহেই, অবস্থান করিতে থাকেন। ইহাই জৈব-ভাব হইতে মুক্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি বা নির্গুণ ব্রহ্মের সমাপবর্ত্তন অথবা সামীপ্য মুক্তি।

সালোক্য মুক্তি—মোক্ষদায়িনীর চরণ লাভ হেতু সোহং-ভাবের দৃঢ়তা হওয়ায় সাধক তখন মহল্লোক বা মাতৃঅঙ্ক লাভ করেন। ইহাই সালোক্য মুক্তি। এই মহল্লোকই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ক্রিয়াত্মক, সগুণ ব্রহ্মলোক। সাধক তখন এই সগুণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া, নিম্নস্থ ব্যক্তলোকের অর্থাৎ স্বঃ, ভুবঃ ও ভূর্লোকের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সাধন করিতে থাকেন। কৃষ্ণ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য ও পরমহংস দেবাদি অবতারগণ, এই লোকে উপনীত হইয়া জগতের সামগ্রীক নব সৃষ্টি সাধন বা জগতকে নবভাবে প্রভাবিত করিয়া, ভগবান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাযুজ্য-মুক্তি—এই মাতৃ অঙ্ক বা মহল্লোকের উর্দ্ধদেশ হইতে নির্গুণ বা অব্যক্তাবস্থার আরম্ভ। সুতরাং এই স্থানের বর্ণনা অতি

সংক্ষেপে বিবৃত হইবে। সাধকের যখন পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মলীলায় পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, তখন সাধক, গুণাতীত সাযুজ্য মুক্তি বা "কৈবল্য" লাভ করেন। এই অবস্থায় সাধক, নিগুর্ণ ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিয়া, মাতৃবক্ষে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। যেন সন্তান, ধূলা খেলা ত্যাগ করিয়া, জননীর বক্ষস্থলে স্থিত ও তদঙ্গিভূত হইয়া স্তন্যপানে নিযুক্ত হইল, এবং ধূলা খেলা, সমস্তই ভুলিয়া, রাজরাজেশ্বর পিতাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এই অবস্থা ইহ-জগতে যেমন অতুলনীয় আনন্দদায়ক, পরমাত্মিক জগতেও তদ্রূপ হওয়ায়, সাধক এই সর্ব্বভোগ-পরিতৃপ্ত কৈবল্যানন্দ ত্যাগ করিয়া, সহজে নির্ব্বাণ লইতে চাহেন না। ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রমুখ মহাত্মাগণ, এইজন্যই মনুষ্যের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর অতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত, স্থূলদেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। সাধক প্রবর রামপ্রসাদ এইজন্যই বলিয়াছেন :—

নির্ব্বাণে কি ফল বল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥

নির্ব্বাণ মুক্তি—সাধক, স্বীয় স্থূলদেহের অবস্থানুরূপ, জীবন-কাল পর্য্যন্ত, এইস্থানে কৈবল্যানন্দ ভোগে রত ও পরিতৃপ্ত হইয়া, নিগুর্ণ ব্রহ্মপদ লাভের শুদ্ধা-ইচ্ছাশক্তির, পরিণতি প্রাপ্ত হইলে, বা স্থূলদেহ অরক্ষ-ণীয় হইলে, মহাসমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। সাযুজ্য মুক্তির মাতৃবক্ষস্থিত সন্তান যেন, মাতৃস্তন্য পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, মাতৃবক্ষ ত্যাগ করিয়া, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপ-সিংহাসন উপবিষ্ট মহারাজাধিরাজ পিতার ক্রোড়ে, ক্রোড়স্থ হইলেন, এবং পিতৃপদই, লাভ করিলেন। অপূর্ণকাম, বাসনা-বিদগ্ধ, সদসৎ কর্ম্মফল সঞ্চিত, মৃত্যুময়-ভীত-চিত্তে, কাল-কবলিত হওয়া ও চতুর্ব্বর্গাদি বা মুক্তি চতুষ্টয়াদি লাভে, কত প্রভেদ তাহা পাঠক অনুমান করিবেন!

পরিশিষ্ট

সাধকের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে, বিপরীত ভাবে চিত্রিত, ষটচক্র সমন্বিত, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ যে প্রণব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই. বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রদর্শিত তত্ত্ব সমূহের ধারণা করা, সাধকের সাধনার বিষয়। উহার ক্ষুদ্রত্বের জন্যই, তত্ত্ব সমূহ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিরাটের প্রতিবিম্বই সরাট ; এবং প্রতিবিম্ব স্বভাবতঃ বিপরীতভাবেই প্রতিফলিত হয়, এই জন্য উহাও বিপরীত ভাবে চিত্রিত। কিন্তু উহার প্রকৃত দ্রষ্টা যে সাধক, তাঁহার পক্ষে উহা প্রাকৃত এবং অবিপরীত ভাবেই বিদ্যমান আছে। কারণ সাধক, উহার অপর পৃষ্ঠ দর্শন করিতেছেন। ইহা শিক্ষিতগণকে বলাই বাহুল্য। এই উভয়ের সমন্বয় সাধনই যোগ সাধন। প্রথমাবস্থায় সাধকের ধারণা হয়, যেন স্বীয় সরাট আত্মা ও দেহ সেই বিরাটেরই প্রতিবিম্ব ; ক্রমে সাধনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভান্তে, স্বীয় সরাট আত্মার বিরাটত্ব সাধিত হইলে, দেখিতে পান যে তদীয় আত্মাই, বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক। ক্রমান্বয়ে সরাট ও বিরাট দেখিতে দেখিতে, সব একাকার হইয়া সার্ব্বজনীন প্রেম ও ধর্ম্ম মূলক একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে, এবং মুক্তি চতুষ্টয় অবলম্বনে নির্ব্বাণত্ব লাভ করেন- ইহাই চরম সিদ্ধি।

সমাপ্ত

বিজ্ঞাপন

ব্রহ্মময়ী চিত্র ও পুস্তক বিক্রয়ের জন্য যদি কেহ এজেণ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তবে কেবলমাত্র প্রকাশকের নিকটে, এতদ্ভন্নই পাইবেন। যাঁহারা এজেণ্ট হইবেন, তাঁহাদিগকে যথানির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে, অধিক মূল্য লওয়া নিষিদ্ধ।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের এজেণ্টগণের, ছবি পাইবার খরচের সস্তা, ও বিক্রয়ের আধিক্য থাকায়, তাঁহারা প্রত্যেক ছবি।০, ও প্রত্যেক বহি।০ এবং ২৫৲ টাকায় প্রতি শত বিক্রয় করিবেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র, প্রত্যেকখানি ছবি ও পুস্তক ।/০ হিসাবে বিক্রেয়। দেবনাগর ও অন্যান্য ভাষায় এই ছবি ও পুস্তক শীঘ্র বাহির হইবে। কলিকাতার এজেণ্টগণকে, বিনা খরচে ছবি ও বহি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে; ভারতের অন্যত্র ভিঃ পিঃ বুক পোষ্টে, পাঠান হয়। ২৫ খানির কম ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। ভিঃ পিঃ তে লইলে, মনিঅর্ডার ফি সমেত নিম্নোক্তরূপ খরচ পড়ে। রেলওয়ে পার্শেলে পাঠাইলে তদনুযায়ী খরচ পড়িবে।

ছবি			পুস্তক		
২৫ খানিতে		।৶১০	২৫ খানিতে		১৶০
৫০	”	॥৶০	৫০	”	২।/০
১০০	”	১।০	১০০	”	৪॥৶০

প্রাপ্তিস্থান।

শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দেওয়ানজী ষ্ট্রীট, রিষিড়া, হুগলী।